শিক্ষিতা পতিতার আত্মচরিত

মানদা দেবী

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯২৯

আমার কৈফিয়ত

পুস্তকের নাম দেখিয়া অনেকেই হয়তো মনে করিবেন যে এইপ্রকার জীবনী লিখিবার উদ্দেশ্য কি? মহৎ জীবনীর উদ্দেশ্য মহৎ হইলেও তাহা সমাজের পূর্ণ চিত্র নহে। আমার জীবন মোটেই মহৎ নহে, অধিকন্তু ঠিক তাহার বিপরীত ; কিন্তু পুস্তকের উদ্দেশ্য মহৎ। আমি পাপী, কলঙ্কিনী, যশের প্রার্থী নহি—সুতরাং আমার জীবনের খাঁটি কথাগুলি আমি যেমন অকপটে বলিতে পারিব, কোনো মহৎই তাঁহার জীবনের ঘটনা তেমন অকপটে বলেন নাই। বলিতে পারেন না। পাপের স্বরূপ চিনিয়া রাখা প্রয়োজন। পাপ জিনিসটা যে কি কৈশোরে তাহা বুঝিতে পারি নাই বলিয়াই আজ আমি—আমি কেন—আমার মতো সহস্র সহস্র নারী পতিতা।

বারবনিতা-জীবনে যে দুঃখ কষ্ট এবং অনুতাপ ভোগ করিয়াছি তাহারই স্মৃতি লইয়া এই পুস্তক রচিত হইয়াছে। যাঁহারা আমাদের জীবনকে সুখময় মনে করেন, আমাদের সংস্পর্শে আসিতে আগ্রহান্বিত, তাঁহারা বুঝিবেন এ পৃথিবীতে যদি নরক থাকে তবে তাহা আমাদের জীবন।

আমি সমাজের ঘৃণিতা, অস্পৃশ্যা—সমাজে আমার স্থান নাই, স্থান থাকাও উচিত নহে, কিন্তু যে সকল সাধুবেশী লম্পট আমাদের সংস্পর্শে থাকিয়াও সমাজের উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আছেন, আমার জীবনীতেও তাহাদেরও কতিপয় চিত্র দেখিয়া সমাজটাকে চিনিয়া রাখিতে পারিবেন। এই ভণ্ডের দল কি প্রকারে অবোধ বালিকার সর্বনাশ করে, তাহার চিত্র দেখিয়া স্তম্ভিত হইবেন।

আমার এই আত্মজীবনীতে ৺ শিবনাথ শাস্ত্রী, ৺ স্যার সুরেন্দ্রনাথ, ৺ দেশবন্ধু দাশ, ৺ ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, ৺ অশ্বিনীকুমার দত্ত, পূজনীয়া শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী, সন্তোষকুমারী গুপ্তা, ঊর্মিলা দেবী, সুনীতি দেবী, মোহিনী দেবী, হেমপ্রভা মজুমদার, বগলা সোম, লেডি অবলা বসু, কামিনী রায়, জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলি, মিসেস বি. এল. চৌধুরি, রমলা গুপ্তা, লীলাবতী দাশ, শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, কৃষ্ণকুমার মিত্র, মহেশচন্দ্র আতর্থী, কাজি নজরুল ইসলাম ও তৎপত্নী, মতিলাল নেহরু ও তৎকন্যা এবং সৈয়দ হুসেন, কুমার গোপিকারমণ রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, আক্রাম খাঁ, আবদুল রহিম, ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, বীরেন শাসমল, জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমন্ত সরকার, প্রতাপ গুহরায়, ৺ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়, ৺ অমৃতলাল বসু, ৺ দীনবন্ধু মিত্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, স্বামী সত্যানন্দ,

স্বামী সচ্চিদানন্দ, তারেকশ্বরের মোহান্ত প্রভৃতি মহোদয় ও মহোদয়ার নাম প্রয়োজনবশত উল্লিখিত হইয়াছে। আমার মতো নূতন লেখিকার অক্ষমতার দোষে যদি তাঁহাদের সুনামের কোনো হানি হইয়া থাকে এজন্য তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট এবং মৃত ব্যক্তিদের আত্মার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

এই জীবনীতে আমার ফোটো দিতে ইচ্ছা করিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু আমার ভূতপূর্ব শিক্ষক মুকুলচন্দ্র ব্যানার্জি উকিল মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে তাহা দেওয়া হইল না।

—বিনীতা
মানদা দেবী

আমার এই জীবনী আমার নিজের লেখা কি অন্য পুরুষের লেখা, তাহা লইয়া একদল লোক মাথা ঘামাইতেছেন শুনিতেছি। নারী সম্বন্ধে পুরুষের নানাপ্রকার হীন ধারণার জন্যই নারী আজ বিশ্বে সমানাধিকার দাবি না করিয়া পারিতেছেন না। যদি তাঁহারা কেবল ইহাই ভাবিয়া থাকেন যে, পতিতার কি বই লিখিবার ক্ষমতা আছে—ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে পতিতগণ যদি বই লিখিতে পারে বা পত্রিকা সম্পাদন করিতে পারেন, তবে পতিতাগণ পারিবে না কেন? বিশেষত পতিতাগণের লিখিত পুস্তকের যথেষ্ট আদর আছে শুনিতে পাওয়া যায়।

প্রতিভার পরিমাপ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি দ্বারা হয় না। পূজনীয়া শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী-নিরূপমা দেবীর কোনো ডিগ্রি নাই, ইঁহারা হিন্দু ঘরের সেকেলে মেয়ে, রিয়েলিস্টিক আর্টেরও কোনো ধার ধারেন না, কিন্তু ইঁহাদের লেখনী হইতে যেমন লেখা বাহির হইয়াছে এ পর্যন্ত কোনো উপাধিধারিণী তেমন সর্বাঙ্গসুন্দর পুস্তক যে লিখিতে পারেন নাই তাহা সর্ববাদিসম্মত।

'ভোটে পতিতার স্থান' নামক একটি অধ্যায় এই পুস্তকের জন্য লিখিত হইয়াছিল কিন্তু তাহা কোনো বিশিষ্ট রাজনৈতিকের মতামত গ্রহণ না করিতে পারায় এবারেও মুদ্রিত হইল না।

আমার জীবনীতে যাঁহাদের প্রতি সামান্য ইঙ্গিত আছে তাঁহাদের নিকট আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। কাহার প্রাণে ব্যথা দিবার জন্য এ পুস্তক লিখিত হয় নাই। বর্তমান সমাজের খাঁটি চিত্র দেখাইয়া সমাজপতিগণের মনোযোগ আকর্ষণই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। আমার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে, সমাজে সাড়া পড়িয়াছে।

নারী পতিতা হইলে তাহার নাকি কোনো মূল্যই থাকে না। তাহাকে অপমান করিলেও আইন অনুসারে 'মানহানি'র দাবি চলে না, কিন্তু 'পতিত' পুরুষের বেলায় এই আইনই কার্যকরী—কারণ আইনপ্রণেতা পুরুষ। আমার উকিল বলেন, আইনের এই ত্রুটির জন্যই সুরুচি পতিতা নহে—এই মিথ্যা কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছে কংগ্রেস কাউন্সিলে যাঁহারা নারীপুরুষের সমানাধিকার দাবি করেন। তাঁহারা কি আইনসভায় ইহার প্রতিকারপ্রার্থী হইতে পারেন না? প্রকাশ্যে পতিতাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাইলে নিন্দার কোনো নতুন কারণ উপস্থিত হইবে না। কারণ কংগ্রেস ও কাউন্সিলের এই

সকল মার্কামারা সদস্যদিগকে দেশের লোক ভালো করিয়াই জানে। যদি আগামী কংগ্রেস ও কাউন্সিলে আমাদের এই দাবি কেহ উপস্থিত না করেন তবে মনে করিব যাঁহারা সমানাধিকারের জন্য চিৎকার করেন তাঁহারা নিছক মিথ্যাবাদী। হয় আমাদের দাবি পুরণ কর—না হয় 'পতিতদিগকেও' কংগ্রেস কাউন্সিল অথবা অন্য কোনো কার্য হইতে বহিষ্কৃত করিবার জন্য আইন কর।

বিনীতা
শ্রীমতী মানদা দেবী

প্রথম

বাল্যে

১৩০৭ সালের ১৮ই আষাঢ় [১৯০০] তারিখে আমি জন্মগ্রহণ করি। আমার পিতা কলিকাতার এক সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্রাহ্মণ। আমি তাঁহার প্রথম সন্তান। পিতার নাম ও পরিচয় প্রকাশ করিতে আমি অক্ষম। তিনি তাঁহার জ্ঞাতিকুটুম্ব, সন্তানসন্ততি এবং সম্পর্কিত ব্যক্তিগণ অনেকেই এক্ষণে জীবিত রহিয়াছেন। সমাজে তাঁহাদের মানমর্যাদা কম নহে। আমার এই আত্মচরিত হয়ত তাঁহাদের হাতে পড়িতে পারে। আমি তাঁহাদিগকে বিব্রত করিতে চাহি না।

আমার পিতামহ একজন সঙ্গতিসম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। কলিকাতাতে তাঁহার চারিখানা বাড়ি এবং নগরের উপকণ্ঠে একখানা বাগানবাড়ি ছিল। তিনি বৃদ্ধ বয়সে রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। আমার পিতা হাইকোর্টের উকিল ছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার পসার বেশ জমিয়া উঠে, বাহিরেও তিনি মাঝে মাঝে যাইতেন।

আইন কলেজে পড়িবার সময় আমার পিতার বিবাহ হইয়াছিল। তখন আমার পিতামহ জীবিত। আমার মাতুল পরিবারও কলিকাতায় বাস করিতেন। তাঁহারা বিশেষ অর্থশালী ছিলেন না, কিন্তু বংশমর্যাদায় উচ্চ এবং রূপে অতুলনীয় সুন্দরী বলিয়া আমার মাতাকে পুত্রবধূ করিবার জন্য পিতামহ বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। আমার জন্মের দুই বৎসর পর আমার পিতামহের মৃত্যু হয়। ঠাকুরদাদার কোলের সুখলাভ যে আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল—কেবলমাত্র কল্পনাতেই সেই স্মৃতি জাগিয়া আছে।

কন্যা বলিয়া আমি শিশুকালে অনাদৃত হই নাই। পিতার বন্ধুগণ কেহ কেহ বলিলেন, 'প্রথম কন্যাসন্তান, সৌভাগ্যের লক্ষণ'। কথাটা হাস্যপরিহাসের সহিত বলা হইলেও, তাহার মধ্যে সত্য রহিয়াছে বোধ হইল। আমার জন্মের কয়েক মাস পূর্বে পিতা আইন ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন। দিন দিন তাঁহার উন্নতি দেখা গেল। কিছুকালমধ্যেই আমার পিতা কোনো সুযোগে বার্ষিক দশ হাজার টাকা আয়ের একটা ছোট জমিদারি নিলামে ক্রয় করিলেন।

শৈশব অবস্থায় আমার শরীর রুগ্ন ছিল। মা আমাকে লইয়া সর্বদাই বিব্রত থাকিতেন। পিতামহ আমার স্বাস্থ্যের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। মৃত্যুশয্যায় তিনি নাকি আমার দিকে চাহিতে চাহিতে চক্ষু মুদিয়াছিলেন। আজ মনে হয় সেই ঋষিতুল্য বৃদ্ধ বুঝি তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস আমার প্রাণের মধ্যে রাখিয়া গিয়াছেন, তাই আমি মরিতে মরিতেও বার বার বাঁচিয়া উঠিতেছি।

আমার যখন তিন বৎসর বয়স, তখন একবার কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছিলাম।

কলিকাতার বড় বড় ডাক্তার-কবিরাজ আমার জীবনের আশা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি লুপ্ত হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় দ্বারকানাথ সেন' আমার চিকিৎসায় বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন।

মা নিত্য শিবপূজা করিতেন। একদিন দুশ্চিন্তার উদ্বেগে নিতান্ত কাতরচিত্তে তিনি পূজার ঘরে অচেতন হইয়া পড়েন। জ্ঞান সঞ্চার হইলে মা বলিলেন 'খুকুমণি সেরে উঠবে, আর কোনো ভয় নাই।' তিনি অন্তরে অন্তরে তাঁহার অভীষ্ট দেবের নিকট হইতে কোনো আশ্বাস পাইয়াছিলেন কি না কে জানে, তারপর হইতে বাস্তবিক আমার দেহ এক প্রকার ঔষধাদি ব্যতীতই নীরোগ হইতে লাগিল। চারি মাসের মধ্যে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হইলাম।

একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। মেঘমুক্ত চন্দ্রের মত আমার দেহকান্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আমার পরিপুষ্ট অবয়ব, উজ্জ্বল মুখশ্রী, দীর্ঘ নিবিড় কুন্তলশোভা, আনন্দোৎফুল্ল চলনভঙ্গি দেখিয়া আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীগণ সকলেই আশ্চর্যান্বিত হইল। আমি পূর্বে ধীর ও শান্তপ্রকৃতি ছিলাম ; কিন্তু এই রোগভোগের পর আমি কিছু চঞ্চল স্বভাব হইয়া উঠিলাম। বিস্কুট লজেঞ্জুস কিনিবার জন্য মায়ের নিকট হইতে পয়সা লইয়া বড় রাস্তার উপরে মনোহারী দোকানে ছুটিয়া যাইতাম, ঘুড়ি ধরিবার জন্য আমাদের বাড়ির প্রশস্ত ছাদে দৌড়াদৌড়ি করিতাম—অবশ্য পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা ছিল না। ঝির সঙ্গে কখনও কখনও তাহাদের বাড়িতে চলিয়া যাইতাম। চাকরেরা আমার দুষ্টামিতে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিত। বাবার বৈঠকখানা ঘরে যাইয়া আমি গোলযোগ আরম্ভ করিতাম। বাড়িতে আর ছোট ছেলেমেয়ে কেহই ছিল না। একমাত্র আমার চিৎকার ও হাস্যকলরবে এত বড় বাড়িখানা সর্বদা মুখরিত থাকিত। বাবার নিকট আমার ছেলেবেলার এই সকল কথা শুনিয়া আমি সঙ্কুচিত হইতাম।

স্নান করা আমার অতি আনন্দের বিষয় ছিল। মায়ের অনুরোধে বাবা আমার জন্য বাড়ির উঠানে একটা বৃহৎ চৌবাচ্চা তৈয়ারি করাইয়াছিলেন। তার মধ্যস্থলে সুন্দব ফোয়ারার জল উঠিত। ছয়-সাত বৎসর বয়সে আমি সাঁতার শিখিয়াছিলাম। স্নান করিবার সময় আমার সমবয়সি প্রতিবেশী ছেলেমেয়েদের ডাকিয়া আনিতাম। আমরা সকলে চেঁচামেচি হুটোপাটি করিয়া সেই বৃহৎ চৌবাচ্চার জলে হাঁসের মত ঘণ্টার পর ঘণ্টা খেলায় মত্ত থাকিতাম। মা আমাকে অত্যন্ত আদর করিতেন, সেই জন্য বাবা আর কিছু বলিতেন না।

আমার আর একটা অভ্যাস ছিল—প্রত্যহ বৈকালে বেড়াইতে বাহির হওয়া চাই। যে দিন বাবা বাহিরে যাইতেন না, সে দিন আমি মায়ের সঙ্গে মোটরে চড়িয়া যাইতাম। আমার এক মামাতো ভাই আমাদের বাড়িতে থাকিয়া স্কুলে পড়িত। তাঁহার নাম ছিল নন্দলাল, তাঁহাকে আমি নন্দদাদা বলিয়া ডাকিতাম। তাঁহার সঙ্গে কখনও কখনও হাঁটিয়া বেড়াইতে যাইতাম। রাস্তার দুইধারে সুন্দর সুন্দর সাজানো দোকানপাট, ট্রামগাড়ি, আলোকমালা, অসংখ্য লোকচলাচল, সেসব দেখিয়া আমার মনে কি আনন্দ হইত। আলিপুরের

চিড়িয়াখানা, চৌরঙ্গীর যাদুঘর, হাওড়ার পুল, পরেশনাথের বাগান, কালীঘাটের মন্দির এসকল আমি বালিকাবয়সেই অনেকবার দেখিয়াছি।

পুতুলখেলা অপেক্ষা পাখি পুষিবার শখই আমার ছিল বেশি। পায়রা, ময়না, টিয়াপাখি, কাকাতুয়া, হিরেমন, শালিক প্রভৃতি নানাপ্রকার সুন্দর পাখি বাবা আমাকে আনিয়া দিতেন। কুকুর বিড়াল আমি ভালবাসিতাম না। ফুলগাছেও আমার মন আকৃষ্ট হইত না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পাখির নেশা আমার কমিয়া আসিয়াছিল।

দ্বিতীয়বার এক মৃত সন্তান প্রসবের সময় আমার মায়ের মৃত্যু হয়। আমার বয়স তখন দশ বৎসর [১৯১০]। প্রাণে দারুণ আঘাত পাইলাম। মৃত্যু কী, তাহা তখন আমি বুঝিতাম। আমাকে কেহ মিথ্যা বাক্যে ভুলাইতে পারিল না—কেহ আমাকে সান্ত্বনার কথা বলিতে পারিল না। আমি চিৎকার করিয়া মাটিতে লুটাইয়া কাঁদিলাম। বাবা আমাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। কিন্তু আমি ছিন্নশির ছাগশিশুর মত ছট্‌ফট্ করিতে করিতে বাবার কোল হইতে নামিলাম। প্রতিবেশীগণ মায়ের মৃতদেহ পালঙ্কের উপর পুষ্পমালায় সাজাইয়া কাঁধে করিয়া লইয়া গেল। আমি তাহাদের পশ্চাতে ছুটিয়া চলিলাম। আমার মনে আছে, কতকদূর যাইয়া ফুটপাতের উপর আছড়াইয়া পড়িয়াছিলাম। মুখ তুলিয়া সম্মুখে চাহিয়া দেখি, বাহকেরা দূরে চলিয়া গিয়াছে। পালঙ্কের পশ্চাদ্দিকে মায়ের আল্‌তা মাখানো পা-দুখানি বাহির হইয়া রহিয়াছে ; তাহাই আমার দৃষ্টিপথে।

আজ আমার দুঃখময় জীবনের কাহিনি লিখিতে বসিয়া চক্ষুর জল ঝরিতেছে। কতদিন কত দুঃখে অশ্রু বিসর্জন করিয়াছি—আমার মনে হইয়াছে, তাহা মায়ের সেই চরণযুগলে নিপতিত হইয়া তাঁর শুষ্ক অলক্তকরাগকে আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে।

মায়ের মৃত্যুতে বাবা খুব কাঁদিয়াছিলেন। তিন দিন পর্যন্ত কিছু আহার করেন নাই। অবশেষে বন্ধুদের সনির্বন্ধ অনুরোধে খাদ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাবার শয়নগৃহের প্রাচীরে মায়ের একখানি বৃহৎ সিপিয়া রং-এর ব্রোমাইড এনলার্জমেণ্ট ছবি ছিল। আমার সপ্তম জন্মতিথিতে বাবা আমাকে উহা উপহার দিয়াছিলেন। সাড়ে-সাতশত টাকা ব্যয়ে তিনি ওই ছবিখানি বিলাত হইতে তৈয়ারি করাইয়া আনেন। মায়ের মৃত্যুর পর হইতে বাবা নিত্য একছড়া ফুলের মালা দিয়া ছবিখানিকে সাজাইতেন।

মায়ের জীবদ্দশাতেই আমি বেথুন স্কুলে ভর্তি হইয়াছিলাম। তাঁহার মৃত্যুকালে আমি ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী। বাড়িতে একজন গৃহশিক্ষক আমাকে ও নন্দদাদাকে পড়াইতেন। মায়ের মৃত্যুর পর বাবা আমাকে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া আনিলেন। বাড়িতে অধিক সময় পড়াইবার জন্য একজন ভাল শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। আমাকে সর্বদা কাছে কাছে রাখিয়া শোকাবেগ কতকটা প্রশমিত করিবার জন্যই বোধ হয় বাবা এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যাহা হউক ইহাতে আমার পড়াশুনার কোনো ক্ষতি হইল না।

ছয় মাস চলিয়া গেল। তখন বাংলাদেশে স্বদেশি আন্দোলনের অব্যবহিত পরেই বোমার গোলযোগ আরম্ভ হইয়াছে। নেতাদের নির্বাসন, যুবকদের কারাদণ্ড, বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার, বোমাওয়ালাদের ফাঁসি, এই সকল ভীষণ ব্যাপারে দেশময় একটা চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। নানা স্থানে সভাসমিতি, লাঠিখেলার আখড়া প্রভৃতি স্থাপিত হইল। আমার পিতা এই আন্দোলনের মধ্যে ছিলেন। নন্দদাদা আমাকে মাঝে মাঝে স্বদেশি সভায় লইয়া যাইতেন। সেখানে কত উত্তেজনাময় বক্তৃতা শুনিতাম।

একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। আমি বেশ গান গাহিতে পারিতাম। স্বাভাবিক শক্তিতেই আমার সুর তাল জ্ঞান ছিল, কণ্ঠস্বরও নাকি আমার সুমিষ্ট—যাঁহারা আমার গান শুনিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আমার এই প্রশংসা করিতেন। সংগীতের ক্ষমতা আমার কিরূপে জন্মিল, আমি বুঝিতে পারি না। আমার পিতামাতা কেহই সংগীতজ্ঞ ছিলেন না। বাবা আমাকে একটি খুব ভাল টেবিল-হারমোনিয়াম কিনিয়া দিয়াছিলেন। একজন শিক্ষক আমাকে এস্রাজ বাজানো ও গান শিখাইতেন।

একদিন দেখিলাম নন্দদাদা দুইখানি লম্বা ছোরা কিনিয়া আনিয়াছে। আমার সম্মুখে টেবিলের উপর ছোরা দুইখানি রখিয়া বলিল 'মানি, তোকে ছোরা খেলা শিখতে হবে।' আমি একখানি ছোরা হাতে লইয়া বলিলাম, 'সে কি নন্দদা?' নন্দদা আর একখানি ছোরার বাঁট ধরিয়া তাহার অগ্রভাগ আমার বুকের দিকে লক্ষ্য করিল! অপর হস্তে আমার ডান হাতের কবজি ধরিয়া এমন ভঙ্গিমায় দাঁড়াইল, যেন সে সত্যই আমাকে মারিতে উদ্যত। আমিও বাঁ হাতে নন্দদা-র ডানহাতের কবজি ধরিয়া ফেলিলাম। সে বলিল, 'এই ত ঠিক, এমনি করেই ত আটকাতে হয়।' আমি কিছুদিন পূর্বে এক স্বদেশি সভায় ছেলেদের ছোরাখেলা দেখিয়াছিলাম, আমি বলিলাম, মেয়েদের এসব শিখে কি হবে?' নন্দলাল বলিল, "কেন রে মানি, শুনিস নি সেই গান—'আপনার মান রাখিতে জননী আপনি কৃপাণ ধর গো'।"

আমি বলিলাম, 'হাঁ, মনে আছে।' এই বলিয়া আমি তখন টেবিল-হারমোনিয়ামের সম্মুখে যাইয়া বসিলাম। তাহার ঢাকনা খুলিয়া চাবি টিপিয়া গলা ছাড়িয়া গান ধরিলাম—

আপনার মান রাখিতে জননী, আপনি কৃপাণ ধর গো—
পরিহরি চারু কনক ভূষণ গৈরিক বসন পর গো
আমরা তোর কোটি কুসন্তান,
ভুলিয়া গিয়াছি আত্মবলিদান,
করে মা পিশাচে তোর অপমান প্রতিকার তার কর গো।

গান শেষ হইলে বাবা আসিয়া বলিলেন, 'কি রে খুকু, তোদের কি হচ্ছে?' নন্দদা মুহূর্তের মধ্যে ছোরা দুখানি লইয়া আর এক দরজা দিয়া ছুটিয়া পলাইল। আজও আমার সে দিনের ঘটনা বেশ মনে আছে।

সে দিন বাবা আমাকে এক স্বদেশি সভায় লইয়া গেলেন। এই গানটি আমি সভাস্থলে গাহিলাম। সকলে আমার খুব প্রশংসা করিল। ৺ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সভায় সভাপতি ছিলেন। আমি তখন বুঝিতে পারি নাই, উহাতেই আমার সর্বনাশ হইতেছে। ওই সভাতে বাবা এক বক্তৃতা দিলেন।

তখন দামোদরেব বন্যায় বর্ধমান সহর ও তাহার বহুদূরব্যাপী স্থানসমূহের গৃহস্থগণ আশ্রয়হীন এবং দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল। তাহাদের দুরবস্থা মোচনের জন্য সাহায্য-ভাণ্ডার খোলা হয়। দেশের সহৃদয় জনাসাধারণ তাহাতে অর্থদান কবেন। অধিক পরিমাণে অর্থ সংগ্রহের জন্য কলিকাতার থিযেটার-সিনেমার বেনিফিট্ নাইট্ অর্থাৎ সাহায্য রজনী ও অপর নানাবিধ আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থাও হইয়াছিল।

এই উপলক্ষে বাবা আমাকে কয়েকবার থিয়েটার ও বায়স্কোপ দেখাইতে লইয়া গিয়াছিলেন। নন্দদাদাও সঙ্গে যায়। থিয়েটারের অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের সংগীত ও অভিনয় দেখিয়া আমি অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলাম। আমার মনে আছে, আমি প্রথম নাটক অভিনয় দেখি, 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'আলিবাবা'। 'দেবী চৌধুবাণী'র 'বীণা—বাজে না কেন' এবং 'আলিবাবা'র 'ছি ছি এত্তা জঞ্জাল' এই দুইটি গান আমি এমন সুন্দর অনুকরণ করিয়াছিলাম যে আমার পিতা অনেকবার বাড়িতে আমার মুখে উহা শুনিয়াছিলেন। রবিবার বায়স্কোপ যাওয়া আমার ক্রমশ অভ্যাস হইয়া উঠিল। কখনও নন্দদাদা, কখনও বা বাবা নিজে আমার সঙ্গে যাইতেন। কোনো কোনো রবিবারে আমি বাবার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা মন্দিরে যাইতাম। আমার পিতা ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী ছিলেন না, কিন্তু সামাজিক রীতিনীতিতে তিনি ব্রাহ্মদের মত উদার ভাবাপন্ন ছিলেন।

মাতার মৃত্যু পর হইতে বাবা প্রতিদিন মায়ের ছবিতে একটি ফুলের মালা দিতেন।

এখন আর মায়ের ছবিতে ফুলের মালা দেওয়া হয় না। বহুদিন যাবৎ একছড়া বেলফুলের মালা উহাতে শুকাইয়া ছিল, একদিন চাকর দেওয়াল ঝাড় দিতে উহা ফেলিয়া দিয়াছে। আমাদের কাহারও মনেই তাহাতে কোনো চঞ্চলতা বা বিরক্তি আসে নাই। সকাল ছয়টা হইতে নয়টা, অপরাহ্ণ একটা হইতে চারিটা মাস্টার মহাশয় পড়াইতেন। শনিবার কখনও কখনও থিয়েটার, রবিবারে বায়স্কোপ যাওয়া আমার নিয়মিত কার্যমধ্যে ছিল।

নন্দদাদার চেষ্টায় ছোরাখেলা শিখিয়াছিলাম। আমার ডান হাতে একটা বড় কাটার দাগ এখনও তার সাক্ষী। বাবার আদেশে ছোরাখেলা পরিত্যাগ করি। তার পরিবর্তে গল্পের পুস্তক পড়ায় আমার মন আকৃষ্ট হইল। আমার গৃহশিক্ষক মহাশয় ইহাতে আমাকে বিশেষ উৎসাহ দিতেন।

'দেবী চৌধুরাণী' নাটক অভিনয় দেখিবার পর আমি বোধ হয় 'ভ্রমর' ও 'কপালকুণ্ডলা' দেখিয়াছিলাম। মাস্টার মহাশয় একদিন আমাকে বলিলেন, বঙ্কিমবাবুর লেখা আসল বই না পড়লে, রস ও সৌন্দর্য উপলব্ধি হয় না। আমাদের বাড়িতে তিনটি আলমারি বোঝাই অনেক পুস্তক ছিল। মাস্টার মহাশয় অনুসন্ধান করিয়া তাহার মধ্য হইতে বঙ্কিমবাবুর

গ্রন্থাবলী বাহির করিয়া দিলেন। আমি দিবারাত্রি সেই উপন্যাস পাঠ করিতে লাগিলাম। সকল স্থানে বুঝিতে পারিতাম না। কিন্তু তথাপি প্রাণে কেমন একটা অপূর্ব পুলকের সঞ্চার হইত। আমাকে দেখাশুনা করিবার নিমিত্ত আমার বিধবা পিসিমা আসিয়াছিলেন। তিনি আমার পিতার জ্যেষ্ঠ ভগিনী। আমার যাহাতে কোনো কিছুর অসুবিধা না ঘটে, সে বিষয়ে তিনি সর্বদা দৃষ্টি রাখিতেন। একদিন আমি শুনিলাম, পিসিমা বাবাকে বলিতেছেন, 'হাঁ রে খোকা এই ত একবৎসর প্রায় হয়ে গেল। আর ত দেরি করা ভাল নয়। তোর শাস্ত্রজ্ঞান আছে—বংশ রক্ষা, পিতৃকুলের জলপিণ্ড, এসব তুই কি জানিস না।' আমি তখন ইহার অর্থ বুঝিতে পারি নাই।

কিছুদিন পরে বাবা আমাকে পুনরায় বেথুন স্কুলে ভর্তি করিয়া দিলেন। আমি পঞ্চম শ্রেণিতে পড়িতে লাগিলাম। আমি স্কুলের গাড়িতেই যাতায়াত করিতাম। কারণ—বাবা বলিলেন, তাঁহাকে এখন প্রায়ই মোটরে যাইতে হয়, সুতরাং আমাকে ঠিক সময়ে স্কুলে পৌঁছাইতে ও স্কুল হইতে লইয়া আসিতে নিজেদের মোটর সকল সময় পাওয়া যাইবে না। গৃহশিক্ষক মহাশয় সকালে ও সন্ধ্যায় দুবেলা আমাকে পড়াইতেন।

যতদিন মা বঁচিয়া ছিলেন, আমি মায়ের সঙ্গে এক বিছানায় ঘুমাইয়াছি। মায়ের মৃত্যুর পর আমি বাবার ঘরে পৃথক বিছানায় শুইতাম। একদিন বাবা আমাকে বলিলেন 'খুকু, তুমি তোমার পিসিমার কাছে ঘুমিও।' আমি কখনও পিতার অবাধ্য হই নাই। আর একদিন বাবা চাকরকে ডাকিয়া দেওয়ালে মায়ের ছবিখানা দেখাইয়া বলিলেন, 'এই বড় ছবিখানা খুকুর পড়বার ঘরে টাঙিয়ে দিস ত।' আমার জন্য দুইটি নূতন বড় বুক্‌কেস্, একখানা বড় মেহগিনি কাঠের সুন্দর টেবিল ক্রয় করা হইয়াছিল। তাহা আমার পড়িবার ঘরে সাজানো হইল। মেজেতে পাতিবার জন্য সুন্দর কার্পেট আসিল। একটা কাটগ্লাসের খুব দামি দোয়াতদানি ও একটি ওয়াটারম্যানের ফাউন্টেন পেন বাবা আমাকে দিলেন। গ্রীষ্মকাল পড়িয়াছিল ; আমার পড়িবার ঘরে বিজলি পাখায় নূতন রং করা হইল। আরও চারিখানা বিলাতি ল্যাণ্ডস্কেপ-ছবির সঙ্গে মায়ের ছবিখানাও সেই ঘরে শোভা পাইল। মাস্টার মহাশয় আমার পড়িবার ঘরের সাজসজ্জা দেখিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন। আমি স্কুলের পড়ায়, নভেল, থিয়েটারে ও সিনেমার আমোদে নিমগ্ন।

এমন সময় এক বসন্ত প্রভাতে আমাদের গৃহদ্বারে নহবতে সুমধুর রৌসানচৌকি বাজিয়া উঠিল। প্রতিবেশী বন্ধুগণ ও আত্মীয়স্বজন অনন্দকোলাহলে মত্ত। পিসিমা কার্যে অতিশয় ব্যস্ত। পিতাকে নববর-বেশে সজ্জিত দেখিলাম। পুষ্পপত্র শোভিত চতুর্দোলা আসিয়াছে। শুভ সন্ধ্যায় শোভাযাত্রার আলোকমালা জ্বলিয়া উঠিল। আমিও উৎসবে মাতিলাম। আমার পড়িবার ঘরের সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় হঠাৎ মায়ের ছবিখানির দিকে আমার দৃষ্টি পড়িল। আমি মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলাম ; আমার চক্ষে জল আসিল। তারপর ধীরে ধীরে যাইয়া বিছানায় শুইলাম। কেহ আমাকে লক্ষ্য করিল না। পরদিন যখন ঘুম ভাঙিল—দেখিলাম বিমাতা আসিয়াছেন।

দ্বিতীয়

কৈশোরে

ক্রশম উৎসবের কোলাহল থামিল। দিন দিন আমিও প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করিতে লাগিলাম। পিসিমার থাকিবার আর প্রয়োজন রহিল না। নববধূকে সংসারধর্ম বুঝাইয়া দিয়া তিনি ছয়-সাত মাস পরে চলিয়া গেলেন। আমি তখন হইতে পিসিমার ঘরে একাকিনী শয়ন করিতাম।

বিমাতা বয়সে আমার অপেক্ষা এক বৎসরের বড় ছিলেন। আমার দেহের গঠন পরিপুষ্ট এবং বলিষ্ঠ হওয়ায় আমাকেই বড় দেখাইত। তিনি সুন্দরী ছিলেন, গৃহকার্য ও লেখাপড়া সামান্যরূপ জানিতেন। তাঁহার সহিত আমার বনিবনাও না হইবার কোনো কারণ ছিল না, কারণ আমি অধিকাংশ সময় আমার পড়াশুনা লইয়াই ব্যস্ত থাকিতাম।

বাবা অন্তঃপুরে আসিলে, বিমাতা প্রায়ই কোনো কার্য-ছলে তাঁহার কাছে থাকিতেন। বিশেষ কোনো প্রযোজন ব্যতীত পিতার সহিত এখন আমার সাক্ষাৎ হইত না। পূর্বে তিনি আমাকে স্কুলের পড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন, কাছে বসিয়া আমার গান শুনিতেন, এখন আর তাহা নাই। বাবা যেদিন বিমাতাকে লইয়া থিয়েটারে যাইতেন, আমাকে নিতেন না, সেদিন নন্দদাদার সঙ্গে আমি বায়স্কোপে যাইতাম।

কি কারণে জানি না, আমার পুরাতন গৃহশিক্ষক ছড়াইয়া দেওয়া হইল। বাবা আমাকে বলিলেন, 'তুমি এখন উপরের ক্লাসে পড়ছ, পুরানো মাস্টারের বিদ্যা ত বেশি নয় ; আজকালকার স্কুল কলেজের শিক্ষাপ্রণালীর সাহিত পরিচিত লোক না হলে চলে না'। কয়েকদিন পরে আমার জন্য নূতন মাস্টার আসিলেন। ইঁহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

প্রথম যেদিন তিনি পড়াইতে আসিলেন, সেদিনই তাঁহার আকৃতি প্রকৃতি ও পরিচ্ছদে আমি একটু আকৃষ্ট হইলাম। তাঁহার লম্বা চুল, কপাল হইতে উলটা দিকে আঁচড়ানো ও ঘাড়ের কাছে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া বাবরি পাকানো—তাঁহার বয়স আন্দাজ বাইশ-তেইশ—দাড়িগোঁপ উঠে নাই, না পরিষ্কার কামানো, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কাপড় ঢিলা মালকোঁচা দিয়া পরিয়াছেন, মনে হয় যেন কাবুলিদের পা-জামা। গায়ে একটা পরিষ্কার ধবধবে সাদা পাঞ্জাবি জামা—তখনও খদ্দরের চলন হয় নাই। তাঁহার সূক্ষ্মাগ্র উন্নত নাসিকা, চোখ দুটি সুন্দর, কিন্তু একজোড়া সোনার ফ্রেমে বাঁধানো চশমা সেই সৌন্দর্যকে অন্য রূপ দিয়াছে। পায়ে নকল জরির কাজ করা নাগরা জুতা। তাঁহার বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, দেহ অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ। তাঁহার কথায় যেন বাঁশি বাজে। তিনি সম্প্রতি বি. এ. পাশ করিয়া কোনো স্কুলে শিক্ষকের কার্য করিতেছেন। মাস্টার মহাশয় অবিবাহিত।

তাঁহার নিকট আমার পড়াশুনা ভালই হইতে লাগিল। তিনি গণিতশাস্ত্র বিশেষ জানিতেন না—তবে সাহিত্য, ইতিহাস, বিশেষত কাব্য তিনি অতি চমৎকার পড়াইতেন। সকালে বিকালে দুইবেলাই তিনি আসিতেন। আমি চতুর্থ শ্রেণি হইতে প্রমোশন পাইয়া তৃতীয় শ্রেণিতে উঠিলাম।

নন্দদাদা আমার দুই ক্লাশ উপরে পড়িত। এবার তার এন্ট্রাস ক্লাসে উঠিবার কথা। কিন্তু লেখাপড়ায় বিশেষ মনোযোগ না থাকায় সে বার্ষিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইল। সুতরাং দ্বিতীয় শ্রেণিতেই রহিয়া গেল। নন্দদাদা ও আমি একই মাস্টার মহাশয়েরর নিকট পড়িতাম।

দুই-চারি দিনের পরিচয়ের পর একদিন মাস্টার মহাশয় আমাকে বলিলেন, 'মানু, তুমি আমাকে 'মাস্টার মশাই' বলো না—এ ভাবটা আমি ভারি অপছন্দ করি। আমাকে আমার নাম ধরে ডাকতে পার।' আমি কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিলাম—আপনি যেমন 'মশাই' কথাটা পছন্দ করেন না, আমিও তেমনি নামের শেষে 'বাবু' যোগ করা ভালবাসি না। দেখেন নি, আজকাল 'বাবু' উঠে গিয়ে 'শ্রীযুতে'র প্রচলন হয়েছে?'

মাস্টার মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, 'তা বেশ, তুমি আমাকে 'মুকুল দাদা' বলে ডাকতে পার। তুমি ত জান আমার নাম মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায়।' এইরূপে মাস্টার মহাশয়ের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা জন্মিতে লাগিল। আমি সেইদিন হইতে তাঁহাকে দাদা বলিয়া সম্বোধন করি।

একদিন বাবা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'খুকু, তোমার মাস্টার মহাশয়ের সকালে বিকালে চা খাওয়ার অভ্যাস আছে। ওঁর চায়ের ব্যবস্থা এখানেই করে দিও। তা হ'লে তিনি আরও একটু আগে আসতে পারেন।'

আমাদের বাড়িতে দু'বেলাই চা তৈরি হইত। পূর্বে বাবার সঙ্গে বসিয়া চা খাওয়া আমার নিয়ম ছিল। আজকাল বাবার চায়ের পেয়ালা বিমাতা হাতে করিয়া নিতেন। বাবাও আমাকে কখনও ডাকেন নাই, আমিও আর সেদিকে যাইতাম না। আমি মাস্টার মহাশয় আসিবার পূর্বেই আমার পড়িবার ঘরে একলা বসিয়া চা খাওয়া শেষ করিতাম।

এখন মাস্টার মহাশয় আমার চা পানের সঙ্গী হইলেন ; সেই সময় আমাদের মধ্যে সামাজিক ও রাজনীতির নানা কথাবার্তা হইত। তখন দেশনেতাদের মহলে 'আত্মশক্তি'র কথা উঠিয়াছে। মাস্টার মহাশয় বলিলেন, 'মানু, আমাদের দেশের শাস্ত্রকারেরা সুখদুঃখের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন 'সর্বং আত্মবশং সুখং সর্বং পরবশং দুঃখং'। অন্নবস্ত্র ত দূরের কথা, সামান্য বিষয়ের জন্যও আমাদিগের পরের উপর নির্ভর করিতে হয়। এই দেখ না কেন, চাকর চা তৈয়ারি করিয়া না দিলে আমাদের চা খাওয়া হয় না ; অথচ ইহা দুই মিনিটের কাজ। আমাদের সমাজে ও পরিবারে বিলাসিতা এত বেড়ে উঠেছে।'

বাবাকে বলিয়া আমি একটি ছোট ইলেক্‌ট্রিক্ হিটার কিনিলাম। আমার পড়িবার ঘরে বিজলি বাতির প্লাগ্ ছিল। তাহার সাহয্যে আমি সহজে জল গরম করিবার ব্যবস্থা করিলাম। পরদিন মাস্টার মহাশয় আসিলে যখন স্বহস্তে চা তৈয়ারি করিয়া তাঁহার সম্মুখে পেয়ালা ও প্লেট ধরিলাম, তখন তিনি আনন্দে হাত বাড়াইয়া বলিলেন, 'বাঃ, উপযুক্ত ক্ষেত্রে পড়লে উপদেশের বীজ এমনি ফলপ্রদ বৃক্ষে পরিণত হয়।' আমি তখন লক্ষ করি নাই, আমার ওই সোনাব চুড়ি পরা হাতখানিব ছায়া পেয়ালার মধ্যস্থিত তপ্ত তরল পদার্থে পড়িবার পূর্বে মাস্টার মহাশয়ের হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়াছিল।

পূজাব সময হাইকোর্টের দীর্ঘ অবকাশ। বাবা বিমাতাকে লইয়া পশ্চিমে বেড়াইতে গেলেন। তাহাদের সঙ্গে দুইজন ভৃত্য ব্যতীত আর কেহ ছিল না। আমার যাইবার খুব ইচ্ছা ছিল। কিন্তু মুখ ফুটিয়া বাবাকে কিছু বলিতে পারি নাই। কারণ আমাকে সঙ্গে নেওয়া যে তাহার অভিপ্রায নয়, তাহা আমি পূর্বেই বুঝিযাছিলাম। আমার হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইলাম। বিদেশে যাইযা পিতা অথবা বিমাতা কেহই আমার নিকট চিঠিপত্র লেখেন নাই। পিসিমা বাড়িতে ছিলেন। তিনি মধ্যে দুই-একখানি চিঠি পাইতেন, আর টাকা পাঠাইবাব জন্য সবকাব মহাশযেব নিকট চিঠি আসিত।

একদিন নন্দদাদা আমাকে বলিল, 'মানি, আজ মিনার্ভা থিয়েটারে যাবি?—চল, শিরীফর্‌হাদ প্লে—খুব সুন্দব অপেরা। একেবারে অফুবন্ত নাচগান। সে একখানি বিজ্ঞাপন দেখাইল। পিসিমার কাছে অনুমতি চাহিলে তিনি বলিলেন, 'তোরা দুজনেই ছেলেমানুষ, মাস্টার মশাইকে সঙ্গে নিযে গেলে ভাল হয়।' বলা বাহুল্য মাস্টার মহাশয় আপত্তি করিলেন না।

আমরা তিনজনে একটা বক্স রিজার্ভ কবিয়া বসিয়াছিলাম। অভিনয় দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম। বিশেষত নৃত্যগীত আমাকে অতিশয় প্রীত করিয়াছিল। মাস্টার মহাশয় প্রতি দৃশ্যের ঘটনাবলি ও চরিত্রসমূহ বিশ্লেষণ করিযা আমাকে বুঝাইয়া দিলেন। ফরহাদের অপূর্ব প্রেম ও শিরীর আত্মবিসর্জন আমাব হৃদয়কে উল্লসিত করিয়া তুলিল। আমি অনুভব করিলাম, আমার বুকের মধ্যে যেন কোন্ সুষুপ্ত পশুর ঘুম ভাঙিতেছে।

মাস্টার মহাশয় প্রায়ই আমার সঙ্গে থিয়েটারে ও সিনেমায় যাইতেন। তিনি না গেলে আমার আমোদ উপভোগ সম্পূর্ণ হইত না। কারণ তিনি সমস্ত বিষয়টি পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়া দিতেন। যেদিন 'বিল্বমঙ্গল', 'শঙ্করাচার্য' কিংবা ধর্মমূলক অভিনয় হইত, সেদিন পিসিমাও আমাদের সঙ্গে যাইতেন। ভক্তি ও ধর্মভাবের নাটকগুলি তাঁহার বড় প্রিয় ছিল।

আমার পিতা তখনও বিদেশে। আমি জ্বরে শয্যাগত। পিসিমা চিন্তাকুল। মাস্টার মহাশয় দিবারাত্রি আমার শয্যাপার্শ্বে থাকিয়া আমার সেবা-শুশ্রূষা করিতেছেন। ডাক্তার ডাকা, ঔষধ আনা, পথ্য তৈয়ারি, আমার কাছে বসা, প্রায় সমস্ত কাজ মাস্টার মহাশয় করিতেন। তাঁহার স্কুল কামাই হইতে লাগিল। বেদনায় অস্থির হইলে তিনি আমার গা

টিপিয়া দিতেন, মাথায় হাত বুলাইয়া আমাকে ঘুম পাড়াইতেন ; আঙুর, বেদানা, নাসপাতি একটু একটু করিয়া আমার মুখে পুরিয়া দিতেন। পিসিমা ইহাতে একটু আশ্বস্ত হইতেন।

যন্ত্রণায় কাতর হইয়া আমি যখন মা মা করিয়া কাঁদিতাম তখন আমি লক্ষ করিয়াছি মাস্টার মহাশয় আমার সমবেদনায় চক্ষুর জল ফেলিয়াছেন। তিনি জানিতেন আমি মাতৃহীনা—পিতার অনাদৃতা কন্যা। একমাস পরে একটু সুস্থ হইয়া আমি ক্ষীণকণ্ঠে বলিলাম, 'মুকুলদা, আপনি আমাকে এবার বাঁচিয়েছেন।' মাস্টার মহাশয় বলিলেন, 'মানু, ভগবান তোমায় রক্ষা করেছেন।' আমি তাঁহার হাতখানি ধরিয়া আবেগে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলাম—'মুকুলদা আপনার স্নেহের ঋণ আমি শোধ করতে পারব না।'

সেই হইতে অন্যের অসাক্ষাতে মাস্টার মহাশয়কে 'তুমি' সম্বোধন আরম্ভ। আমাদের হৃদয় যেন পরস্পর অধিকতর নিকটবর্তী হইল। একদিন তিনি একখানি সুন্দর বাঁধানো ক্ষুদ্র কবিতাপুস্তক আমার হাতে দিয়া বলিলেন, 'মানু, আমার 'ঝরণা' ছাপা হয়েছে। তোমার সেবা করবার যে সুযোগ পেয়েছি, তাকে চিরস্মরণীয় করবার জন্য আমার এই প্রথম গীতিকাব্য তোমারই নামে উৎসর্গ করেছি।' আমি ঈষৎ লজ্জিতভাবে পুস্তকখানি লইয়া বলিলাম, 'মুকুলদা তুমি তোমার কবিতা ছাপাতে দিয়েছ, এ কথা তা আমাকে কখনো বলনি।' মাস্টার মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, 'ওইটি অপরাধ হয়েছে?'

আমাকে ইংরাজি সাহিত্য পড়াইবার সময় মাস্টার মহাশয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাসমূহ বাংলা পদ্যে অনুবাদ করিয়া দিতেন। তিনি যে কবি ও ভাবুক তাহার পরিচয় পূর্বে পাইয়াছিলাম। 'ঝরণা'র অনেক কবিতা আমার সম্মুখেই লেখা হইয়াছিল। আজ পুস্তক আকারে গ্রথিত হওয়াতে উহার মধ্যে যেন নূতন ভাব দেখিতে পাইলাম।

দিল্লি, আগরা, মথুরা, বৃন্দাবন, লাহোর, প্রয়াগ, কাশী, গয়া প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিয়া বাবা পাঁচ মাস পরে কলিকাতায় ফিরিলেন। হাইকোর্ট খুলিবার পরেও দুইমাস তাঁহার কামাই হইল। ওকালতি ব্যাবসা করিবার আর তেমন ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। এখন তিনি নিজের বিষয়কর্ম দেখিতে অধিক মন দিলেন।

আমার এক দূর-সম্পর্কীয় জ্ঞাতি ভ্রাতা চাকুরির চেষ্টায় এক দিন আমাদের বাড়িতে পিতার নিকট আসেন। তাঁহাকে আমি পূর্বে কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তিনি কিন্তু আমার সঙ্গে নিতান্ত পরিচিতের মত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি রে মানু, কেমন আছিস? কোন্ ক্লাসে পড়িস? কে তোকে বাড়িতে পড়াচ্ছে?' আমি বলিলাম, 'এখন বেথুনে সেকেন্ড ক্লাসে পড়ছি। মুকুলবাবু আমার প্রাইভেট্ টিউটর।'

তিনি আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, 'ও—আমাদের 'ঝরণা'র কবি মুকুল বাঁড়ুয্যে?—সে যে আমার ক্লাসফ্রেণ্ড, একসঙ্গে স্কটিস্ চার্চ কলেজে পড়েছি।' সন্ধ্যাবেলায় মাস্টার মহাশয় আসিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, 'কি ভাই মুকুল, শুনলুম তুমি মানুকে পড়াচ্ছ। বেশ। তারপর—কাব্যচর্চা ছাড়া আর কি কাজকর্ম হচ্ছে?'

মাস্টার মহাশয় তাঁহার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা কহিলেন। আমাকে বলিলেন,

'রমেশবাবু যে তোমাদের আত্মীয় এ কথা ত মানু তুমি আমায় বল নি।' আমি বলিলাম, আমি ত জানতাম না। বাবা সেদিন এঁর পরিচয় দিলেন। 'রমেশদাদা বলিলেন, 'আমি প্রায় দশ বৎসর পূর্বে একবার এ-বাড়িতে এসেছিলাম। তখন মানদার বয়স ৩/৪ বৎসর হবে। তখন আমি সবে মাত্র এণ্ট্রান্স দিয়েছি ; স্বদেশি আন্দোলন হল, পড়াশুনা ছেড়ে কয়েক বৎসর খুব হৈচৈ করা গেল। তারপর কলেজে ভর্তি হলুম। গত বৎসর এম. এ. পাশ করে এতদিন বসে আছি।'

আমার পিতার চেষ্টায় রমেশদাদার একটা ভাল চাকুরি হইল—কোনো লিমিটেড কোম্পানির অফিসের বড়বাবু, বেতন মাসিক দুইশত টাকা। তিনি প্রথম প্রায় একমাস আমাদের বাড়িতেই রহিলেন। পরে কোনো বোর্ডিং-এ একটা ভাল কামরা ভাড়া করিয়া থাকিলেন। বাবার নিকট বলিলেন, 'হাতে কিছু টাকা জমাইয়া বাড়ি ভাড়া করি—তখন মা, স্ত্রী ও ছোট ভাইবোনেদের এখানে লইয়া আসিব।' সেই বৎসরই রমেশদাদার বিবাহ হইয়াছিল।

পিসিমা চলিয়া গিয়াছেন। আমার মায়ের মৃত্যুর পর হইতে বামুন ঠাকুরই রান্না করিত। দুইটি ঝি ও তিনটি চাকর আমাদের বাড়িতে ছিল। নিত্যপ্রয়োজনীয় কোনো জিনিসের অভাব আমার হয় নাই। সুস্বাদু খাদ্য-পানীয়, বিচিত্র বসন-ভূষণ, প্রচুর পরিমাণে আসিয়াছে। আমার পড়িবার ঘর ও শয়নগৃহের সজ্জা অতুলনীয়, আরামের ব্যবস্থা একেবারে নিখুঁত। তথাপি আমার প্রাণের ক্ষুধা মিটিত না। পিতার অনাদর, অবজ্ঞা এই ক্ষুধাকে নিত্য সতেজ রাখিত। রাস্তা দিয়া যাইবার সময় যখন দেখিতাম কুলি-মজুরেরা তাহাদের ছেলেমেয়েকে কোলে লইয়া আদর করিতেছে, তখন আমি আমার সকল ঐশ্বর্যকে মনে মনে ধিক্কার দিতাম। আমি বুঝিয়াছিলাম, দৈহিক অভাব মোচনই আদর নহে—অন্নবস্ত্র প্রদানই আদর নহে—আদর প্রাণের জিনিস, প্রাণকেই উহা স্পর্শ করে, ভাবেই উহার প্রকাশ।

আমার ত্রয়োদশ জন্মতিথির পূর্ব দিন বাবা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'খুকু, তোমার মাস্টার মহাশয় ও রমেশদাদাকে নিমন্ত্রণ করো।' জন্মদিনের উৎসব করিতে আমার আর ভাল লাগিল না। তথাপি কোনো প্রকারে দিনটা চলিয়া গেল। বিমাতা আমাকে একছড়া সোনার হাড় উপহার দিলেন। রমেশদাদার নিকট হইতে একটা রূপার সুদৃশ্য পাউডারকৌটা উপহার আসিল। মাস্টার মহাশয় বোধ হয় দিয়াছিলেন একখানি রবীন্দ্রনাথের কাব্য।

আমি ছোটগল্প ও কবিতা লিখিতে শিখিয়াছিলাম। রমেশদাদা তাহা পড়িয়া খুব প্রশংসা করিলেন। তিনি বলিলেন, 'মুকুলকে দিয়ে মাসিক কাগজে এগুলো ছাপিয়ে দাও। এ ত বেশ সুন্দর হয়েছে। আজকাল মেয়েদের কি রাবিস্ লেখা বের হয়।'

আজকাল রমেশদাদাও আমাদের সঙ্গে থিয়েটার যাইতেন। নন্দদাদা এখন ফুটবল ও ক্রিকেট খেলায় মাতিয়াছিল, সে আর বড় একটা যাইত না। বিশেষত সে বেচারা নাটকের সাহিত্যের দিকটা কিছুই বুঝিত না এবং অভিনয়ের মধ্যে যে আর্ট আছে, তাহাও তার উপলব্ধি হইত না। স্টেজের উপরে যুদ্ধবিগ্রহ, নাচগান, সাজপোশাক এসব জমকালো রকমের হইলেই সে খুশি হইত।

তখন থিয়েটারে একটা পরিবর্তন আসিতেছিল। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভদ্র যুবকেরা থিয়েটারে যোগ দিয়া তাহার মধ্যে শিল্পকলার বিকাশ করিতে অগ্রসর হইলেন। রমেশদা ও মুকুলদা এই অভিনব আর্টিস্টদের মর্যাদা বুঝিতেন এবং তাহাদের খুব প্রশংসা করিতেন। রমেশদার নিকট অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নাম ও পরিচয় আমি জানিলাম। এমন কি তাহাদের ভিতরের জীবনকাহিনিও তিনি আমাকে কিছু কিছু শুনাইলেন—যাহা মুকুলদারও অজ্ঞাত ছিল।

দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিবার দুই বৎসর পরে আমার পিতার একটি পুত্রসন্তান হয়। ইতিমধ্যে তিনি ওকালতি ব্যবসায় সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই বৈমাত্রেয় ভাইটিকে আমি অতিশয় স্নেহ করিতাম ; কিন্তু তাহার জন্য পৃথক আয়া ও দাসী নিযুক্ত হওয়ায় আমি তাহাকে সর্বদা কোলে নিতে পারিতাম না। সন্তান প্রসবের পর বিমাতার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল। বাবা তাঁহাকে লইয়া বিব্রত হইলেন। বড় বড় ডাক্তার-কবিরাজ নিত্য আসিতে লাগিল। আট নয় মাস পরে বিমাতা একটু সুস্থ হইলেন বটে, কিন্তু শরীরের দুর্বলতা দূর হইল না।

আমার পিতার কোনো কোনো বন্ধু এবং আমার পিসিমা অনেকবার বাবার নিকট আমার বিবাহের কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন, আমার কানে তাহা আসিয়াছে। বাবা বলিলেন, 'এত অল্প বয়সে মেয়ের বিয়ে দিব না। ম্যাট্রিক পাশ করুক, তারপর দেখা যাবে।' পিসিমা ও পিতার বন্ধুগণ ইহার উত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন, সে সমস্ত এখানে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আজকাল খবরের কাগজে এ বিষয়ে নানা বাদ-প্রতিবাদ ও তর্কবিতর্ক আপনারা পাঠ করিয়া থাকেন।

আমার যৌবনোদ্ভব হইয়াছিল। অভিভাবকের অসাবধানতায় ও অনুকূল পবনে যথাসময়ে আমার হৃদয়ের মধ্যে প্রবৃত্তির অনল জ্বলিয়া উঠিল, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। বিবাহের জন্য মনে মনে আমার আকাঙ্ক্ষাও হইত।

তৃতীয়

পলায়ন

বেথুনে পড়িবার সময়ে আমার তিনটি অন্তরঙ্গ বালিকা-বন্ধু লাভ ঘটিয়াছিল। তন্মধ্যে কমলার পরিচয় একটু বিশেষভাবে দিব। কারণ তাহার জীবনের সহিত আমার জীবন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে জড়িত। বাল্যকালের কোনো বন্ধুর সহিত এখন আর দেখা হয় না। অনেককেই ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু কমলাকে এখনও ভুলিতে পারি নাই। সেও আমাকে হয়ত ভুলে নাই। আজ এই আত্মচরিত লিখিবার সময়ে তাহার কথা প্রতিমুহূর্তে আমার মনে হয়—অতীত জীবনের সুখদুঃখের কত কথা মনে হইতেছে।

কমলা পরমা সুন্দরী ছিল—ছিল কেন, এখনও বোধ হয় আছে। নারীর সৌন্দর্য সম্বন্ধে

পুরুষেরা বলিযা থাকে, 'স্ত্রীলোক কুড়ি পার হইলেই বুড়ি।' একথা সকলের সম্বন্ধে খাটে না। কুড়িব পর আরও কুড়ি বৎসর চলিয়া গিয়াছে, তবু এমন নারী হিন্দুসমাজে যথেষ্ট আছে, যাহাদের সৌন্দর্য ভাদ্রেব ভরানদীর মত ঢল ঢল, শরতের জ্যোৎস্নার ন্যায় অনাবিল, তাহাতে মলিনতার লেশ মাত্র নাই। আমি নিজে নারী হইয়া নারীর রূপে আকৃষ্ট হইয়াছি, শুনিযা হয়ত আপনারা হাসিবেন।

শুধু রূপে নহে, গুণেও কমলা আমার চিত্তকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তাহার ভালবাসা ও সহানুভূতি আমি চিরদিন সমভাবে পাইয়াছি। আমোদ প্রমোদ, গানবাজনায়, হাস্যপরিহাসে, খেলাধূলায়, লেখাপড়ায় সকল বিষয়ে তাহার সমান অধিকার ছিল। স্কুলের প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউসন (পুরস্কার বিতরণ) অথবা অন্য কোন উৎসবের আয়োজনে কমলার সাহায্য না লইলে চলিত না। সে মেয়েদের গান ও অভিনয় শিখাইত।

একবার কোনো বালিকা বিদ্যালয়ের গৃহনির্মাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ চেষ্টায় ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে নানাবিধ আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা হয়। আমার রমেশদা তাহাতে একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। সেই উপলক্ষে বোধ হয় বেথুন, ডায়োসিসান প্রভৃতি বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা মিলিয়া নবীন সেনের 'কুরুক্ষেত্র' কাব্য হইতে নির্বাচিত দৃশ্যের অভিনয় করে। তাহাতে আমি 'শৈলজা'র অংশ লইয়াছিলাম, কমলা নিজে 'জরুৎকারু' সাজিয়াছিল। আমাদের অভিনয় দেখিয়া দর্শকগণ চমৎকৃত হইয়াছিলেন। শৈলজার দুটি গান আমার মাস্টার মহাশয় রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। কমলা তাহাতে সুর যোজনা করিয়া আমাকে শিখাইয়াছিল। অর্জুনের প্রেম লাভে নিরাশ শৈলজার অন্তরের ব্যথা সেই গানে ফুটিয়া বাহির হইয়াছিল। সেই গান এখনও মাঝে মাঝে গাহিয়া আমি শান্তি পাই।

কমলা বৈদ্যবংশের মেয়ে। কলিকাতায় বাগবাজারে একখানা সাধারণ দোতলা বাড়িতে তাহার মাতার সহিত বাস করিত। কমলার পিতা কার্যোপলক্ষে নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। মাঝে মাঝে দুই এক-মাস বা দশ-পনেরদিন কলিকাতায় আসিয়া থাকিতেন। কমলার একটি ছোট ভাই স্কুলে পড়িত। সে কমলার অপেক্ষা ছয় বৎসরের ছোট ছিল।

বাড়িখানা কমলাদের নিজের। সুতরাং তাহার পিতা মাসিক যে দুইশত টাকা পাঠাইতেন, তাহাতে তাহাদের জীবিকানির্বাহ স্বচ্ছন্দে হইয়া যাইত।

আমি কমলাদের বাড়ি অনেকবার গিয়াছি। তাহার মাতা অতি শান্তস্বভাব ও স্নেহশীলা। তিনি আমাকে আদরের সহিত কত সুমিষ্ট খাদ্য আহার করাইতেন। আমি মাতৃস্নেহে বঞ্চিত ছিলাম বলিয়া সহজেই কমলার মায়ের বিশেষ অনুগত হইয়া পড়িলাম। তিনি সর্বদাই আমাকে বলিতেন, 'তুমি আমার কমলার ছোট বোন।' কমলা বয়সে আমার দুই বৎসরের বড় ছিল।

কাশীতে কমলার পিতার এক বন্ধু বাস করিতেন। তাঁহার চেষ্টায় এক যুবকের সহিত কমলার বিবাহ হয়। উহা দুই বৎসর পূর্বের কথা। কমলা তখন আমাদের সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে। যুবকটি কাশীতেই চাকুরি করিত, তাহার পিতামাতাও সেখানে থাকিতেন।

গ্রীষ্মের পূজার ছুটিতে কমলা কাশীতে স্বামীর কাছে যাইত। কমলা ও তাহার স্বামীর মধ্যে যে সকল চিঠিপত্র চলিয়াছে, তাহা সমস্তই আমি দেখিয়াছি। আমরা দুইজনে গোপনে বসিয়া তাহাদের কত অর্থ বিশ্লেষণ করিতাম।

আমাদের সহপাঠী বন্ধুদের মধ্যে এই সব চিঠি লইয়া কত হাস্য পরিহাস চলিত। আমার আরও দুই-তিনটি বিবাহিত বন্ধু ছিলেন। তাঁহাদের স্বামীপ্রেমের ভিতরের রহস্যও আমি জানিতাম। প্রথম প্রণয়সম্ভাষণ, বাসররজনী যাপন, মান-অভিমানের অভিনয়, পুরুষের ব্যবহার প্রভৃতি বিষয় লইয়া মেয়েমহলে নিত্য আলোচনা হইত। এই সকলের মধ্যে আমি আমার ছোটগল্পের প্লট ও কবিতার উপাদান পাইতাম। তাই মুকুলদা বলিতেন, 'মানু, তোমার গল্পে ও কবিতায় আমি রিয়্যালিস্টিক আর্টের গন্ধ পাচ্ছি।'

প্রায় আট-নয় মাস হইল, কমলার সহিত তাহার স্বামীর বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। ইহার কারণ বড় ভয়ানক। কমলার শ্বশুর কিরূপে শুনিয়াছেন, কমলার মাতা কমলার পিতার বিবাহিত পত্নী নহে—রক্ষিতা মাত্র। সুতরাং জানিয়া শুনিয়া পতিতা নারীর কন্যাকে তিনি পুত্রবধূরূপে গৃহে রাখিতে পারেন না। তিনি লিখিয়া জানাইয়াছেন কমলাকে তিনি আর গ্রহণ করিবেন না, পুত্রের পুনর্বার বিবাহ দিবেন। তিনি আরও ভয় দেখাইয়াছেন, যদি কমলা ভরণপোষণের দাবি করে, পরে আদালতে তিনি সমস্ত কলঙ্কের কথা প্রকাশ করিয়া দিবেন এবং প্রতারণার অভিযোগ করিয়া কমলার পিতার বিরুদ্ধে পালটা মোকদ্দমা আনিবেন।

এই ব্যাপার উপলক্ষ্যে কমলার স্বামী যে কয়েকখানা পত্র তাহার নিকট লিখিয়াছিলেন তাহা বড়ই করুণ। তিনি কমলাকে অতিশয় ভালবাসিতেন। কমলাও তাহার স্বামীর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিল। কে যেন দারুণ খড়্গাঘাতে প্রেমের বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিল। কমলার স্বামী লিখিয়াছেন, 'কি করব, তোমার কোনো অপরাধ নেই জানি, কিন্তু আমি পিতার অবাধ্য হতে পারি নে। আমায় ক্ষমা কর কমলা। ধর্মসাক্ষী করে তোমায় পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম, আবার ধর্মের মুখ চেয়েই তোমায় পরিত্যাগ করছি। অগ্নিপরীক্ষার পরও রামচন্দ্র কলঙ্কিত পত্নীকে নিয়ে গৃহধর্ম পালন করতে পারেন নি, সীতার মত পত্নীকে বিসর্জন করতে হয়েছিল। এখন বিদায়, 'আমার ভালবাসা তুমি চিরদিন পাবে, কিন্তু পত্নীরূপে নহে'।

এই পত্রের উত্তর আমিই কমলাকে লিখিয়া দিয়াছিলাম। পত্রের উত্তর দিবার কমলার ইচ্ছা ছিল না। তার প্রাণে বড় আঘাত লাগিয়াছিল। বাহিরের আমোদ প্রমোদে সে তাহা ভুলিবার চেষ্টা করিত, কিন্তু আমি তাহার হৃদয়ের অন্তস্তল পর্যন্ত দেখিতাম। আমার অনুরোধ ও উপদেশে কমলা শেষে এইরূপ লিখিল, 'তুমি যাহা সিদ্ধান্ত করেছ, তাহা অটল থাকুক। তোমার পিতৃভক্তি যেন বিচলিত না হয়। তুমি ভারতের আদর্শ গৌরব দেখিয়ে যে দৃষ্টান্ত দিয়েছ, তাঁহার শেষ চিত্র তোমার চোখে পড়ে নি। পরশুরামের প্রায়শ্চিত্ত, ভীষ্মের শরশয্যা, রামচন্দ্রের বিলাপ তুমি ভুলে গিয়েছ। পিতৃভক্ত মাতৃঘাতী কুঠার হস্তমুক্ত করবার জন্য পরশুরামকে দীর্ঘকাল তীর্থ ভ্রমণ করতে হয়েছিল, পিতৃভক্তি

তাকে রক্ষা করতে পারে নি। প্রেমে প্রত্যাখ্যাত অম্বার তপস্যা ভীষ্মের ক্ষাত্রশক্তিকে নপুংসকের হস্তে পরাভূত করেছিল, পিতৃভক্তি তাকে রক্ষা করতে পারে নি। এ জগতে প্রত্যেক কর্মের ফল পৃথক ও স্বাধীন।'

'একের দ্বারা অন্যের প্রতিরোধ হয় না। তোমায় উপদেশ দেওয়া আমার কর্তব্য নহে। প্রগল্‌ভতা ক্ষমা করো। তুমি মহৎ, তাই আমায় পরিত্যাগ করেও চিরদিন ভালবাসবে বলছ, কিন্তু আমি তোমার মত মহৎ নই—আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র—স্রোতে ভাসিয়া চলিলাম, জানিনা না কোথায়।'

কমলার এই পত্রেরও উত্তর আসিয়াছিল। তাহাতে তাহার স্বামী লিখিয়াছিলেন, 'কমলা আমার অপরাধ বুঝেছি। প্রায়শ্চিত্তের দিন এলে মাথা পেতে শাস্তি গ্রহণ করব। তখন যেখানেই থাকো হতভাগ্যকে একবার মনে কোরো।' বুঝিলাম কমলার স্বামীর প্রাণ আছে। সে যথার্থ দরদী, কিন্তু অবস্থার দাস। সমাজের কৃত্রিমতার আঘাতে এমন কত হৃদয় স্বভাবের পথে পরিচালিত হইতে পারে না। সমাজবিধি এমন করিয়া মানবজীবনের পরিস্ফূর্তির পথে অন্তরায় হয়।

কমলার মায়ের সম্বন্ধে যে কলঙ্কের কথা রটিয়াছিল তাহা কতদূর সত্য আমি তাহার অনুসন্ধান করি নাই। পদ্মফুলের মূল থাকে কাদায়—সূর্য তাহার খোঁজ রাখে না। সে জলের উপরে ফুলটিকে ফুটাইয়া সুখী হয়—বাতাস তাহাকে দোলায়—ভ্রমর তার মধু পান করে।

কমলা আমাদের বাড়িতে প্রায়ই আসিত। আমার পিতাও তাহাকে স্নেহ করিতেন। মাস্টার মহাশয়, আমি, কমলা ও রমেশদাদা মাঝে মাঝে বেড়াইতে যাইতাম। কমলাদের বাড়িতে চা-পার্টির নিমন্ত্রণ হইত। কমলার মাতা ধনীর গৃহিণী না হইলেও আমাদের আদর যত্নের ত্রুটি হইত না। তিনি স্বহস্তে সমস্ত খাবার প্রস্তুত করিতেন।

আমি যে সকলের সঙ্গে এরূপ অবাধ মেলামেশা করিতাম, ইহাতে পিতার কোন আপত্তি ছিল না। পূর্বেই বলিয়াছি, তিনি সামাজিক ব্যাপারে উদার মত পোষণ করিতেন। আমাদের বাড়ির পশ্চাতে খানিকটা মাঠের মত জায়গা ছিল। আমি বাবাকে বলিয়া সেখানে একটি টেনিসকোর্ট তৈয়ারি করাইলাম। নন্দদাদা এ বিষয়ে উদ্যোগী হইল। রমেশদা, মুকুলদা, কমলা, আমি নন্দলাল এবং আরও কয়েকজন বন্ধু বৈকালে এই মাঠে টেনিস খেলিতাম। মুকুলদা খেলা কিছুই জানিতেন না—তাঁহাকে অনেক ধরিয়া বাঁধিয়া শিখাইয়া লইলাম। কমলা খেলায় খুব নিপুণ ছিল। সে সর্বদাই আমার প্রতিদ্বন্দ্বী থাকিত। রমেশদা ও মুকুলদা কখনও আমার পক্ষে কখনও কমলার পক্ষে খেলা করিত।

বিমাতা আমাদের সংসারে আসিবার সময় পিত্রালয় হইতে একটি দাসী আনিয়াছিলেন। তাহার নাম ছিল হরিমতি। তাহাকে ঝিয়ের কাজকর্ম কিছুই করিতে হইত না। সে ছিল অনেকটা আমার বিমাতার পার্সন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট বা প্রাইভেট্ সেক্রেটারি। তাহার বয়স প্রায় ৪৫/৪৬ হইবে। বোধ হয় সে বিধবা—থান কাপড় পরিত, হাতে নোয়া ও সিঁথিতে

সিন্দুর দিত না, তাহার গলায় একছড়া সরু বিছাহার ও হাতে চারিগাছি সোনার চুড়ি ছিল। সে একাদশীর উপবাস করিত, মাথায় গন্ধ তেল মাখিত ও চব্বিশ ঘণ্টা দোক্তা পান চিবাইত। চাকর বেচারাদেব উপর যে তার কটাক্ষপাত না হইত এমন নহে।

বাড়ির এক নিভৃত কোণে হরিমতি তার শোয়ার ঘর ঠিক করিয়াছিল। উহা সে প্রয়োজনমত সাবধানে তালাচাবি দিয়া বন্ধ করিয়া রাখিত। দুপুরবেলা সে ওই ঘরে যাইয়া ঘুমাইত। তার নিজের কোনো নির্দিষ্ট কাজ না থাকায় অপর সকলের কাজের উপর ওস্তাদি করিয়া বেড়াইত—আর খামকা কথা তুলিয়া কেবলই গোলযোগ পাকাইত।

আমার এইরকম চালচলন হরিমতি দুই চক্ষে দেখিতে পারিত না। সে প্রথমে বিমাতাব নিকট আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল। কিন্তু বিমাতা আমার প্রায় সমবয়সি, বিশেষত মায়ের মত গাম্ভীর্য ও শাসন করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। তিনি রুক্ষভাষিণী ও কোপনস্বভাব নহেন। সুতরাং তিনি আমায় কিছুই বলিলেন না। বিফলমনোরথ হইয়া হরিমতি বাবার কাছে গেল ; কিন্তু সেখানেও কোন সুবিধা হইল না।

অবশেষে সে নিজেই আমাকে শাসন করিতে আরম্ভ করিল। একদিন হরিমতি আমাকে বলিল, 'আচ্ছা, খুকুমণি এসব কি বলত! পাড়াময় লোক ছি ছি কচ্ছে। জ্ঞাতি ভাই আছে, মাস্টার আছে—বেশ, তাদের সঙ্গে সভ্য ভব্য হয়ে কথা কও। হাসতে হাসতে পুরুষের গায়ে ঢলে পড়া—গলাগলি হয়ে বেড়ানো! তুমি সোমত্ত মেয়ে—বিয়ে হলে এদ্দিনে ছেলের মা হতে!'

হরিমতি যাহা বলিয়ছিল তাহা মিথ্যা নয়, এজন্য আমি কোনো উত্তর দিলাম না। মাথা নিচু করিয়া রহিলাম। ঝগড়া করা আমার স্বভাব নহে। বিশেষত এক্ষেত্রে বাদ-প্রতিবাদ আমার পক্ষে সুবিধাজনক হইবে না, তাহা আমি জানিতাম। ঘটনা যে পাড়াময় হইয়াছে, একথা হরিমতি আমাকে ভয় দেখাইবার জন্য বলিয়াছিল। তবে ইহাও আমি জানিতাম, যদি আমার কখনও বদনাম রটে, তবে তাহা হরিমতির দ্বারাই হইবে।

কিছুদিনের মধ্যেই আমার ধারণা সত্যে পরিণত হইল। হরিমতি যখন দেখিল মুখের কথায় শাসাইয়া আমাকে জব্দ করিতে পারিল না, তখন সে পাড়াময় আমার বদনাম রটাইতে লাগিল। কথা ক্রমশ বাবার কানে উঠিল, তিনি বিশ্বাস করিলেন না। তিনি সংবাদদাতাকে বলিলেন, 'আমাদের দেশের মেয়েরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিলে অমনি সাধারণ লোক নানা মিথ্যা কলঙ্কের কথা রটায়। কারণ এদেশে স্ত্রী-স্বাধীনতা চলিত নহে।'

আমার জেদ বাড়িয়া উঠিল। মুকুলদা আমাকে একদিন কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, 'প্রেমের পথে যতই বাধাবিঘ্ন আসে, ততই উহা প্রবল হয়।' ইহার প্রমাণ আমি হৃদয়ের মধ্যে পাইতে লাগিলাম।

আমার প্রথম যৌবনের উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা প্রাণের মধ্যে জাগিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখে দেখিলাম দুইটি যুবক—মুকুল ও রমেশ। প্রকৃতির নিয়মে ইহাদের দিকে প্রবৃত্তির প্রবাহ প্রবল বেগে ছুটিল। আমাকে টানিয়া রাখিবার জন্য শাসন মাতৃস্নেহ, আদরযত্ন ছিল

না। আজ মনে হয়, আমার মা বাঁচিয়া থাকিলে হয়ত এপথে আসিতাম না। আমার বাবা যদি একদিনও একটু আদর করে আমার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতেন, অথবা শাসন কবিতেন, তবে বোধ হয় এ জীবনের গতি ফিরিয়া যাইত।

মুকুলদা একটু ভীরু স্বভাব। রমেশদা ছিল সাহসী ও বেপরোয়া। একদিন দুপুরবেলা বাবা বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া পড়িতেছিলেন। আমাদের স্কুল ছুটি। অফিসও বন্ধ। রমেশদা আসিযা বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কাকাবাবু, মানি কোথায়?' বাবা বলিলেন, 'উপরে আছে—কেন?' রমেশদা বলিলেন, 'আজ আমরা বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াতে যাব, মানি যদি যায, তবে কাকিমাকে সুদ্ধ নিয়ে যাব।' বাবা বলিলেন, 'যাও জিজ্ঞেস করে এস।'

বমেশদা একেবাবে আমার শোবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি অর্ধ-শয়ান অবস্থায গীতগোবিন্দের একটা কবিতা পড়িতেছিলাম। তিনি পালঙ্কের উপরে আমার পাশে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মানি, আজ বোটানিক্যাল গার্ডেনে যাবে?—চল।' আমি বলিলাম, 'না রমেশদা, আজ শরীরটা ভাল নয়।' রমেশদা আমার কপালে হাত দিয়া কহিলেন 'কই, কিছুই ত নয়। দেখি হাত।' তিনি আমার বাম হাতখানি টানিয়া নাড়ি টিপিয়া বলিলেন, 'কিছু না, তোমার সব চালাকি।' তিনি আমার আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে তাঁহার আঙুলগুলি প্রবেশ করাইয়া পাঞ্জা ধরার মত আমার হাত টিপিতে লাগিলেন। আমার সমস্ত দেহে বিদ্যুৎ তরঙ্গের মত এক অপূর্ব পুলকের সঞ্চার হইতেছিল।

আমি কাত হইয়া ফিরিয়া শুইলাম। একটু মুচকি হাসিয়া বলিলাম, 'নাড়ি টিপিয়া আর কপালে হাত দিয়াই বুঝি সব ব্যারাম ধরা যায়।' রমেশদা এই পরিহাসের অর্থ বুঝিয়া বলিলেন, 'তবে আমাকে বিনা স্টেথিস্‌কোপেই পরীক্ষা করতে হয়।'...

কিছুক্ষণ পরে রমেশদা বাহির হইয়া গেলেন। হিংস্র ব্যাঘ্র যেমন রক্তের স্বাদে উন্মুক্ত হয়, আমিও তেমনি হইলাম। আমার মনে কিছুমাত্র ভয় বা অনুতাপ আসিল না। বরং আশঙ্কা ও সংকোচ কাটিয়া গেল। বুঝিলাম ইচ্ছা থাকিলে সুযোগের অভাব হয় না।

ছয়-সাত মাস চলিয়া যায়। আমি প্রবৃত্তির অনলে ইন্ধন দিতেছি। রমেশদা তখনও বোর্ডিং-এ থাকেন। নানা অছিলা দেখাইয়া পরিবার আনেন নাই। মুকুলদা কমলার প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মমতে কমলাকে বিবাহ করিতে সম্মত, এইরূপ ভাবও দেখাইয়াছেন। আমি তাহাতে সন্তুষ্ট হইলাম। কমলা কিন্তু তখনও দূরে দূরে—সে তার পূর্বের স্বামীকে এত শীঘ্র ভুলিতে পারে নাই।

একদিন রমেশদা আমার নিকট প্রস্তাব করিল, আর ত এ বাড়িতে হতে পারে না। এমন স্থানে চল, যেখানে নিত্য তোমায় দেখব—প্রতি মুহূর্তে তোমায় প্রাণের কাছে রাখতে পারব। পাথরের পাহাড় চুরমার করে যখন নদীপ্রবাহ একবার বেরিয়েছে, তখন চল একবারে মুক্ত প্রান্তরে যেয়ে পড়ি। আমি কোনো উত্তর না দিয়া রমেশদার গলা জড়াইয়া তাঁর বুকে মাথা লুকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম।

আমাদের বার্ষিক পরীক্ষা নিকটবর্তী হইয়াছিল। বাড়িতে সকালবেলা অধিকক্ষণ পড়িবার জন্য আমি বাবাকে বলিয়াছিলাম যে এখন স্কুলের গাড়ি প্রথম ট্রিপেই নয়টার সময় আমাকে নিতে আসে ; অথচ ক্লাস বসে সাড়ে-দশটায়। বহু সময় আমার বৃথা নষ্ট হয়। বাবা বলিলেন, 'বাড়ির মোটর মেরামত করতে দেওয়া হয়েছে। যতদিন না আসে ততদিন ট্যাক্সি করে যেয়ো। নন্দলাল আর তুমি একসঙ্গে যাবে। আগে তোমাকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে তারপর নন্দকে দিয়ে আসবে।' পরদিন হইতে আমি ও নন্দদা ট্যাক্সিতে স্কুলে যাইতাম। আসিবার সময় নন্দলাল আগে ট্যাক্সি করিয়া আসিত। আমি তাহার জন্য স্কুলে অপেক্ষা করিতাম।

দুই-তিন দিন যাবৎ আমার মাঝে মাঝে বমি হইতেছে। মুখ দিয়া কেবল থুতু উঠে। রমেশদা শুনিয়া একটু স্তব্ধ হইলেন। পরদিন তিনি আসিয়া বলিলেন, 'মানি, আমি চার মাসের ছুটি নিয়েছি। চল পশ্চিমে যাই। আর বেশি দেরি কোরো না। কাল স্কুলে যাবার সময় নন্দকে আগে নামিয়ে দিয়ে তুমি ট্যাক্সি নিয়ে একেবারে আমার বাসায় যেও। আমি সব জিনিসপত্র গুছিয়ে ঠিক করে রাখব, যা যা কেনবার প্রয়োজন, মুকুলকে টাকা দিয়েছি।' আমার প্রাণ আনন্দে অধীর হইল।

মুকুলদা নিয়মিত সময়ে পড়াইতে আসিতেন। আমার সহিত রমেশদার প্রণয়ের কথা মুকুলদার নিকট গোপন ছিল না। এই উপলক্ষ্যে তাঁর নূতন কবিতা রচিত হইয়া গেল—'মাধুরী' নামে আর-একখানি কাব্যগ্রন্থ লেখা হইল।

পরদিন যথাসময়ে আমি ও নন্দদা ট্যাক্সি চড়িয়া স্কুলে রওয়ানা হইলাম। আমি পুস্তক অথবা খাতা কিছুই নিলাম না। নন্দদাকে বুঝাইলাম, 'এখন পরীক্ষার জন্য আমাদের পুরানো পড়া রিভাইজ্ হচ্ছে, বই নিয়ে কি হবে!' গাড়িতে উঠিয়া নন্দদা তাহার রিস্টওয়াচের দিকে চাহিয়া বলিল, 'ওঃ মানু, আমার বড্ড দেরি হয়ে গেছে।' আমি বলিলাম, 'তা হলে নন্দদা, তুমি আগে নেমে যাও, আমার একটু পরে গেলেও ক্ষতি নাই!' এমনি করিয়াই অপ্রত্যাশিত সুযোগ আসিয়া জোটে। আমি ভাবিতেছিলাম নন্দদাকে কি বলিয়া আগে নামাইবার ব্যবস্থা করি। সাধুর সৎকার্যের বুদ্ধি যিনি প্রেরণ করেন, চোরের মাথায় ফিকিরফন্দিও তিনিই যোগান।

নন্দদাকে তাহার স্কুলে নামাইয়া দিয়া আমি একেবারে সোজাসুজি রমেশদার বাসায় উপস্থিত। দেখিলাম, সেখানে মুকুলদাও রয়েছেন। রমেশদা একটা সুটকেশ লইয়া আমার সহিত অন্য এক ট্যাক্সিতে উঠিলেন। মুকুলদার নিকট এইখানেই বিদায় নিলাম। তাড়াতাড়িতে কমলাকে কিছুই জানানো হয় নাই। মুকুলদাকে বলিলাম তিনি যেন কমলাকে সকল বিষয় খুলিয়া বলেন। ট্যাক্সি হাওড়া স্টেশনের দিকে অগ্রসর হইল। পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলাম, মুকুলদা চক্ষুর জল মুছিতেছেন।

বাড়ি হইতে বাহির হইবার পূর্বে একবার মনে হইয়াছিল, যাইবার সময় মায়ের ছবিখানিকে প্রণাম করিয়া যাইব, কিন্তু মানসিক উদ্বেগে সেকথা ভুলিয়া গেলাম। ভালই

হইয়াছে। বলিতে হইবে, কারণ মায়ের ছবির প্রতি দৃষ্টি পড়িলে বোধ হয় এতবড় জঘন্য দুঃসাহসের কার্য করিতে পরিতাম না।

আমরা একটা লোকাল ট্রেনে বর্ধমান যাইয়া কিছুক্ষণ থামিলাম। তারপর সন্ধ্যায় লাহোর এক্সপ্রেসে একেবারে দিল্লি অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

চতুর্থ

ভুল ভাঙিল

আমি ঘর ছাড়িলাম কেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুব স্পষ্টভাবেই দিব। প্রবৃত্তির উত্তেজনায় মোহাচ্ছন্ন ও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া আমি গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছি। শরীরধর্মের স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে যে বয়সে আমাদের যৌবনচাঞ্চল্য দেখা দেয়, তখন বিবাহ সংস্কারের দ্বারা তাহাকে সংযত করিবার ব্যবস্থা সমাজে আছে। বালকবালিকাদিগকে সুশিক্ষায় নিরত এবং সর্বদা সৎসঙ্গে রাখিলে এই যৌবনচাঞ্চল্য অল্পবয়সে আসিতে পারে না। কিন্তু আমাদের সমাজে বর্তমান সময়ে সুশিক্ষা ও সৎসঙ্গরই অভাব। তাহার ফলে তরুণ হৃদয়ে অকালে যৌবনসম্মেলনের উদ্দাম কামনা জাগ্রত হইয়া উঠে।

আমি সুশিক্ষা ও সৎসঙ্গ কিছুই পাই নাই। স্কুলে শিক্ষার ফলে কাব্য কবিতা-গল্প-উপন্যাস প্রভৃতি তরল সাহিত্যই পড়িতে শিখিয়াছি। তাহাতে আমার হৃদয়ে কল্পনার উত্তেজনায় দুষ্প্রবৃত্তিই সকলের আগে মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে। সদ্‌গ্রন্থ কখনও পড়ি নাই—যাহাতে সংযম শিক্ষা হয়, যাহাতে ধর্মভাবের উদয় হয় এমন কোনো পুস্তক কেহ আমার হাতে দেয় নাই। আমোদপ্রমোদ যাহা ভোগ করিয়াছি, তাহা সমস্তই অতি নিম্নস্তরের। থিয়েটারে নাচগান, সিনেমার চিত্র কখনও হৃদয়ে সদ্ভাব জাগ্রত করে নাই। অল্পবয়স্কদের তাহা হইতে শিক্ষালাভের চেষ্টা বিপদ্‌জনক। দুই একটা দাঁত উঠিলেই যদি শিশুকে মাছ খাইতে দেওয়া যায়, তবে সে যেমন গলায় কাঁটা বিঁধিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, থিয়েটার দেখায় ও নভেল পাঠেও দেশের তরুণতরুণীদের সেই মরণদশা ঘটিতেছে। আমার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে এই কথা বলিতেছি। আমার মত যাহারা আছে তাহারাও ইহার সমর্থনে সাক্ষ্য দিবে।

বেথুন স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পড়িয়াই আমার মনে হইয়াছিল আমি খুব জানি। তরুণ সাহিত্যিকদের গল্প-উপন্যাস যথেষ্ট পড়িয়াছিলাম ; বিশেষত মুকুলদার অনুগ্রহে শেলি, বায়রন, শেক্সপীয়র, বিদ্যাপতি, ভারতচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিম, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির পুস্তকও কিছু কিছু অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। সুতরাং অহংকার যে আমাকে ফুলাইয়া তুলিবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি।

যাহারা কেবল কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করে, সংসারের কঠোর সত্য সম্বন্ধে তাহাদের কোনো জ্ঞান জন্মে না। কবি ও সাহিত্যিকেরা এই রকম ধরনের লোক। তাঁহারা শুধু চিন্তা

লইয়াই খেলা করেন, কর্মের ধারেও ঘেঁসেন না। মুকুলদার শিক্ষায় আমার এই দশা হইয়াছিল। কাব্য-কবিতা ও নাটক-নভেলের মধ্য দিয়া সংসারকে কল্পনার চক্ষে যেমন দেখিয়াছি, প্রকৃত কর্মক্ষেত্রে আসিয়া দেখিলাম সে সমস্তই মিথ্যা।

আমি যখন গৃহত্যাগ করি তখন আমার বয়স পনের বৎসর। এই বয়সে যদি আমি আমাকে নিঃসহায় ও বুদ্ধিহীনা মনে করিতাম, যদি ভাবিতাম যে আমি সংসারের কিছুই জানি না—যদি আমার পদে পদে ভয় হইত, তবে আমি কখনই এমনভাবে বাহির হইতাম না। কিন্তু একটা মিথ্যা গর্ব আমাকে দুঃসাহস ও দূরদৃষ্টিহীন করিয়া তুলিল। আজ মনে হয়, আমি যদি উপযুক্ত অভিভাবকের অধীন থাকিতাম, তবে আমার ভাল হইত। স্বাধীনতার মধ্যেও যে পরাধীনতার প্রয়োজন আছে, তাহা এখন বুঝিয়াছি।

ভাবিয়াছিলাম, ঘরের বাহির হইলেই বুঝি সকল বাধা দূর হইয়া যাইবে, প্রবৃত্তির ভোগ একেবারে পূর্ণমাত্রায় চালাইতে পারিব। কিন্তু দিল্লিতে পৌঁছিয়া দেখিলাম, ব্যাপার বড় গুরুতর। পুলিশের ভয়—আমাদিগকে লুকাইয়া থাকিতে হইবে। বিদেশে, লোকজন, সমস্তই অচেনা। আমরা বাঙালি, কোথায় যাই কোথায় থাকি কী খাই! রমেশদা বাহিরে গেলে কিরূপে একাকী ঘরে থাকিব! নানারকম সমস্যা—বহু প্রকারের অসুবিধা। বাড়িতে যে ইহা অপেক্ষা ছিল ভাল। সেখানে ত আরও স্বাধীন ছিলাম—এমন কি রমেশদার সহিত গুপ্ত প্রণয়ের সুযোগও ছিল বেশি।

অবশ্য টাকার জোরে সকল অসুবিধাই অতিক্রম করা যায়। কিন্তু রমেশদার কি এত টাকা আছে। আমি ত প্রায় একবস্ত্রে বাহির হইয়া আসিয়াছি। রমেশদা আড়াই হাজার টাকা সঙ্গে আনিয়াছেন। বসিয়া বসিয়া খাইলে ইহাতে কতদিন চলিবে? পশ্চিম ভারতের যে কোনো শহরেই থাকি, খুব উঁচু স্টাইলে ভাল হোটেলে থাকিতে হইবে। আমার কাপড়চোপড় ও কিছু গহনাপত্র চাই। একটা ছোকরা চাকরের দরকার। আমরা শাকভাত, ডালরুটি খাইয়া সন্ন্যাসীর মত গাছতলায় থাকিতে নিশ্চয়ই আসি নাই। আমাদের জীবন ভোগের পূজা, তাহার উপকরণ কাঞ্চন।

দিল্লিতে এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল ; মুকুলদার পত্রে জানিলাম বাবা আমার জন্য খুব অনুসন্ধান করিতেছেন ; কিন্তু পুলিশে এজেহার দেন নাই। রমেশদার উপর ঘোরতর সন্দেহ হইয়াছে। তাঁহার অফিসে ও বাড়িতে খবর লওয়া হইতেছে। কমলা অতিশয় দুঃখিত। দিল্লি হইতে লাহোরে গেলাম।

রমেশদা পুরা এক বৎসরও চাকুরি করেন নাই। এরই মধ্যে তিনি কিরূপে চারিমাসের ছুটি পাইলেন, একথা কখনও আমার মনে হয় নাই।

কতদিন কাজ করিলে কতদিন ছুটি মিলে—কোন্ অফিসের কী রকম দস্তুর, ইহার খোঁজখবর কাব্য-উপন্যাসে পাওয়া যায় না। আমি ভাবিয়াছিলাম অফিসের কেরানিরা চাহিলেই ছুটি পায়।

আমরা রেলপথে সেকেণ্ড ক্লাসে ভ্রমণ করি। বর্ধমানে গাড়িতে উঠিয়া রমেশদা সুটকেস

খুলিলেন। আমার সম্মুখে পাঁচ তাড়া নোট রাখিয়া বলিলেন, 'মানু, এই আমাদের সম্বল।' আমি গুনিয়া দেখিলাম প্রত্যেক তাড়ায় ১০০ খানি পাঁচ টাকার নোট। এই আড়াই হাজার টাকা রমেশদা কোথায় পাইলেন তখন ভাবি নাই। মাসিক ২০০ টাকা করে এক বৎসরের বেতনও আড়াই হাজার হয় না। রমেশদা বোধ হয় বড়লোকের ছেলে—বাপের টাকা উড়াইতেছেন। তাও ত নয়। আমার পিতার কাছে রমেশদা চাকুরিপ্রার্থী হইয়াছিলেন। অর্থাভাবে মাসাবধি তিনি আমাদের গৃহে অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এত কথা তখন আমার মনে হয় নাই। কারণ ভোগলালসা যার সৃষ্টি, সেই শয়তান সমস্ত ভুলাইয়া রাখে। সুখের স্বপ্নে বিভোর গন্ধর্ব দম্পতি অথবা কিন্নরমিথুনের মত আকাশের মধ্য দিয়া চলিয়াছি—মাটিতে আর পা পড়িতেছে না।

লাহোর হইতে আমরা অমৃতসরে যাই। সেখানে তিনদিন থাকিয়া কাশ্মীরে যাত্রা করি। শ্রীনগরে আমরা প্রায় একমাস থাকি। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতিশয় মনোরম তাহা সকলেই জানেন। আমাদের নূতন প্রেমের বন্যা এখানে খুব উছলিয়া উঠিল।

বোম্বাই আসিলাম। আমার ভয় ক্রমশ কাটিয়া গেল। প্রথমে যে সকল বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল, এখন তাহা দূর হইল। পুলিশের ভয় নাই। রমেশদা খুব চতুর ও হুঁশিয়ার লোক। যদিও মুকুলদার চিঠিতে জানিয়াছিলাম বাবা পুলিশে এজেহার দেন নাই, তথাপি তিনি যেখানেই যাইতেন, সেখানেই প্রথম থানার পুলিশ কর্মচারীদের সহিত আলাপ-পরিচয় করিতেন। গ্রেপ্তারি পরওয়ানার কোনো গন্ধ পাইলে সময় থাকিতে সরিয়া পড়িবেন। এই তাঁহার মতলব ছিল।

স্কুলে নীচের ক্লাসে পড়িতেই আমি ইংরাজিতে বেশ কথা কহিতে পারিতাম। মুকুলদার শিক্ষায় ও রমেশদার সঙ্গে থাকিয়া এই বিষয়ে আমার আরও উন্নতি হইয়াছিল।

হোটেলে আমরা সাহেবি স্টাইলে থাকিতাম। আমি পার্শি মেয়েদের ধরনে কাপড় পরিতাম। সকলের সঙ্গে মেলামেশা করিতে আমার ইংরাজি কথা বিশেষ সহায় হইয়াছিল। বিদেশের খাওয়াদাওয়া, চালচলন আমি অল্প সময়ের মধ্যেই শিখিয়া লইলাম। প্রথম প্রথম আমি এসব লইয়া অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলাম। রমেশদা আমাকে বলেন, 'হাঁ, রে মানু, তোরা বাংলা দেশের মেয়ে যদি পাঞ্জাবে এসে মনে করিস, ও রে বাবা—এ কোথায় এলাম, বোম্বাই-এর লোক যদি বাংলায় যেয়ে খাওয়া দাওয়া চলাফেরা নিয়ে মুস্কিলে পড়ে, মাদ্রাজিরা যদি অযোধ্যাকে ভাবে বিদেশ তবে বল্ দেখি সমগ্র ভারতে জাতীয়তা গড়ে উঠবে কি করে?'

আমি বললাম, 'ভারতবর্ষ এক বৃহৎ দেশ, এর মধ্যে ভাষার, ধর্মের, সামাজিক রীতিনীতির এত বৈচিত্র্য ও বৈষম্য যে এখানে একজাতি গড়ে ওঠা অসম্ভব মনে হয়।' রমেশদা জোরের সহিত বলেন, 'এই অসম্ভবকেই সম্ভব করতে হবে।' রমেশদার এই একটা গুণ দেখিয়াছি, তিনি যেখানেই গিয়াছেন, তাহাকে নিতান্ত পরিচিত স্বদেশ বলিয়া মনে করিতেন—শুধু চিন্তায় নহে, কর্মেও। দিল্লি, লাহোর, শ্রীনগর, বোম্বাই এই সকল

শহরে থাকিবার সময় ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ও তীর্থ স্থানসমূহ দর্শন করিয়াছিলাম। ইহাতে আমার মানসিক বিকৃতি কিয়ৎ পরিমাণে দূর হইল। চঞ্চলতার পরিবর্তে হৃদয়ে শান্তভাব আসিল। রমেশদা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন।

শ্রীনগর হইতে বোম্বাই যাইবার পথে আমরা দ্বারকা ও রাজপুতানা হইয়া গিয়াছিলাম। পুষ্কর, ভরতপুর, জয়পুর, চিতোর প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া আমার প্রাণে এক অপূর্ব প্রশান্ত ভাবের উদয় হইল। আমি বাড়ির কথা, বাবার কথা, সমস্ত ভুলিয়া গেলাম। একবার বাবার সঙ্গে এদিকে বেড়াইতে আসিতে চাহিয়াছিলাম। তিনি বিমাতার পক্ষপাতী হইয়া আমাকে লইয়া আসেন নাই। আজ রমেশদার অনুগ্রহে আমার সেই সাধ পূর্ণ হইল। আমি হাঁটিবার সময় রমেশদার হাত ধরিয়া চলিতাম, মোটরে চড়িয়া যাইবার সময় রমেশদার গলা জড়াইয়া বসিতাম। পশ্চিম ভারতের সেই উঁচুনিচু রাস্তায় মোটরে চলিবার সময় স্প্রিং-এর মৃদু দোলায় নাচিয়া নাচিয়া আমাদের পরস্পর-আনন্দিত-বক্ষে কি পুলকের তরঙ্গ উঠিত। রমেশদার প্রতি শুধু প্রেমে নহে, কৃতজ্ঞতায়ও আমার হৃদয় ভরিয়া গেল।

হলদিঘাট দেখাইয়া রমেশদা বলিলেন, 'এই আমাদের ভারতের থার্মোপলি—যেখানে পনের হাজার রাজপুত দেশের জন্য প্রাণ দিয়াছিলেন। এ বীরত্বগৌরব আজ আমরা ভুলে গেছি।' রমেশদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িলেন। আমি ডি. এল. রায়ের 'রাণা প্রতাপ' নাটকের অভিনয় দেখিয়াছিলাম। আমি বলিলাম, 'এমন কঠোর ব্রত, এমন তীব্র বৈরাগ্য—স্বদেশের দাসত্বমোচনের জন্য এমন অপূর্ব স্বার্থত্যাগ আর কে করতে পারে? এত বড় উচ্চ আদর্শ আমাদের কল্পনায়ও আসে না।'

পদ্মিনীর জহরব্রতের স্থান দেখিলাম। দর্শনার্থীরা সকলে প্রণাম করিতেছে। তাহাদের দেখাদেখি আমিও মাথা নোয়াইলাম, আমার বুক কাঁপিতেছিল। হাত দুখানি অবশ হইয়া আসিল, আমি পড়িয়া যাইতেছিলাম। পার্শ্বে দণ্ডায়মান রমেশদাকে ধরিয়া বলিলাম, 'চল, এখান থেকে যাই।'

সেই সতীরানী স্বর্গ হইতে আমায় কি আশীর্বাদ করিয়াছিলেন আমি জানি না। আজ মনে হয়, যদি ভারতে পদ্মিনীর মত সতীর আদর্শ না থাকিত, তবে মানবসমাজের পথপ্রদর্শক এক উজ্জ্বল ধ্রুবতারা খসিয়া পড়িত। পুরাণে শুনিয়াছি দক্ষযজ্ঞে এক সতীর অনলপ্রবেশ, আর এই দেখিলাম বহু সতীর আত্মত্যাগের মহিমাময় তীর্থক্ষেত্র। বুঝিলাম, জহরব্রতের তিমিরগহ্বরের অগ্নিশিখা পদ্মিনীর দেহ দগ্ধ করে নাই, পাপীর ভোগলালসাকেই পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিয়াছে।

একদিন সন্ধ্যায় আমরা বোম্বাই নগরীর অন্তর্গত মালাবার শৈল পল্লীতে বায়ুসেবনার্থ ভ্রমণ করিতেছিলাম। ট্যাক্সি বিদায় দিয়া আমরা ধীরে ধীরে পদব্রজে চলিতেছিলাম, সেদিন আমার মন বড় খারাপ ছিল। কেন, তাহা পরে বলিতেছি। দুপুরবেলা আমি ঘুমাইয়া কাটাইয়াছি। রমেশদা খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা হয় নাই। আমার বিমর্ষ ভাব লক্ষ করিয়া তিনি আমাকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন।

চারিদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখিয়া আমার কিঞ্চিৎ প্রফুল্লতা আসিল। রমেশদা 'হাঁ রে মানু, তোর এই মলিনমুখ দেখবার জন্যই কি ঘরবাড়ি, পরিবার পরিজন ছেড়ে এসেছি? ব্যাপার কি বল্ দেখি?' এই বলিয়া তিনি আমাকে বাঁ হাতে জড়াইয়া ধরিয়া খুব ঝাঁকিয়া দিলেন। আমি তাঁর বুকে মাথা রাখিয়া মুখ নিচু করিয়া রহিলাম। আমার কান্না পাইল। তিনি আমার চিবুক ধরিয়া আমার দিকে চাহিলেন। অস্পষ্ট আলোকে আমার ছল ছল চক্ষুতে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনি পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া আমার চক্ষের জলবিন্দু মুছাইয়া দিলেন। এসেন্সের মৃদু সুবাস আমাকে পুলকিত করিয়া চারিধারে ছড়াইল। আমরা নিকটবর্তী একখানা বেঞ্চির উপরে বসিলাম।

তিনি বলিলেন, 'মানু, তোমার জন্য সমস্ত ছাড়িয়া আসিলাম। নিজের স্ত্রী, বিধবা মা, ছোট ভাইবোন সকলের কথা আজ তোমারই জন্য ভুলিয়াছি। শেষে তুমিও আমায় পরিত্যাগ করবে? তোমায় নিয়ে কী বিপদের সম্মুখে ঝাঁপিয়ে পড়েছি, তা দেখেই বুঝতে পার তোমায় কত ভালবাসি।' রমেশদা আবার আমাকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। আজ আমার এ সকল আদর সোহাগ যেন ভাল লাগিতেছিল না। সম্মুখে অস্পষ্ট অন্ধকারের দিকে আমি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম। আমার হাতদুখানি কোলের উপরে অঞ্জলিবদ্ধ ছিল। রমেশদা আমার ডান হাতখানি তুলিয়া তাঁহার নিজের কাঁধের উপর নিয়া রাখিলেন। আমি রমেশদাকে অনাদর করিয়াছি ভাবিয়া লজ্জিত হইলাম।

চারিদিক নিস্তব্ধ। পার্শ্ববর্তী প্রশস্ত পথ দিয়া শৈলবিহারী শৌখিন লোকেদের দুই-একখানি মোটরগাড়ি মাঝে মাঝে মৃদুশব্দে চলিয়া যাইতেছে। রমেশদা বলিলেন, 'চুপ করে আছিস কেন, কি হয়েছে?' আমি বলিলাম, 'না কিছু হয় নি। আজ কমলার চিঠি এসেছে, তুমি ত দেখেছ।' আমি ডান হাত দিয়া ভাল করিয়া রমেশদার গলা জড়াইয়া ধরিলাম।

একটা সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে তিনি বলিলেন, 'ও, বাড়ির কথা মনে পড়েছে বুঝি। আরে তুই একেবারেই কচি খুকিটি!' একগাল ধোঁয়া ছাড়িয়া তিনি পুনরায় বলিলেন, 'আচ্ছা মানু, বাড়িতে তোমার কি আকর্ষণ আছে বল দেখি। মনে কিছু কোরো না ; আমি স্বরূপ কথাই বলছি। তোমার মা নাই, ভাইবোন নাই। পিতা দ্বিতীয়পক্ষের ষোড়শী পত্নীকে নিয়ে আমোদ করে বেড়াচ্ছেন—মেয়ের দিকে ফিরেও চান না, শোবার ঘর থেকে কৌশল করে তোমায় সরিয়েছেন—তোমার মায়ের ছবিখানাকেও দূর করে দিয়েছেন। সেখানে তোমার কি সুখ আছে বল।'

আজ রমেশদা অমন কথা বলিলে তার উত্তর আমি অন্যরূপ দিতাম। কিন্তু তখন আমি ভাবিয়াছিলাম সত্যই : 'রমেশদা, আমি মরুভূমি থেকে ছুটে এসে শীতল জলধারার সন্ধান পেয়েছি, আমায় ক্ষমা কর। তুমি আমার জন্য কী ছেড়ে এসেছ তা দেখবার আমার প্রয়োজন নাই, আমার সম্মুখে তুমি যে প্রেমের নৈবেদ্য সাজিয়ে এনেছ, আমি শুধু তাই দেখছি।'

সেখান হইতে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া আমরা সিনেমায় গেলাম। আমার হৃদয়ের

প্রফুল্লতা ফিরিয়া আসিল। আমি মনে করিলাম, কেন বৃথা দুশ্চিন্তার ভার বৃদ্ধি করিতেছি। যখন সুধার পাত্র সম্মুখে রহিয়াছে, তখন কোন্ মূর্খ তাহা গ্রহণ না করিয়া মুখ ফিরিয়া চলিয়া যায়?

কমলার যে পত্রের কথা পূর্বে বলিয়াছি তাহাতে সে আমাকে লিখিয়াছিল যে সে আমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছে। তিনি আমার জন্য খুব মনোকষ্ট পাইতেছেন। পুলিশকে তিনি জানাইবেন না অথবা কোনো মামলা-মোকদ্দমাও করিবেন না। বিমাতা আমার কথা মনে করিয়া কাঁদেন। হরিমতি তাহার ভবিষ্যৎ-বাক্য সুফল হওয়াতে খুব আনন্দিত। সে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বলেছে, 'সে আমি আগেই জানি।' নন্দদাদা স্কুল ছাড়িয়া দিয়াছে। সে নাকি বলিতেছে, 'আমি যেরূপে পারি মানুকে খুঁজে আনব।' মুকুলদার সহিত কমলার বিবাহের প্রস্তাবে কমলার মা সম্মতি দিয়াছেন। রমেশদার বাড়ির খবর কিছুই পাওয়া যায় নাই।'

এই পত্র পড়িয়া আমার প্রাণে বড় দুঃখ হইয়াছিল। বিমাতা বেচারি বড় ভাল ছিলেন। তিনি আমাকে ভালবাসিতেন, কিন্তু কখনও তাহা প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তিনি চতুরা নারীর মত স্বামীর মন ভুলাইতে কপটতার আশ্রয় লইতেন না। তাঁহার সরল প্রাণ পিতার ইচ্ছা অনুসারেই চলিত। তাঁহার জন্য আমার কষ্ট হইল। আর কষ্ট হইল, নন্দদাদার কথা ভাবিয়া, তাহার অসাবধানতার জন্যই আমি পলায়ন করিতে পারিয়াছি। বোধ হয় এজন্য সে হতভাগ্য বাবার কাছে বকুনি খাইয়াছে। তাই বুঝি সে লেখাপড়া ছাড়িয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, আমাকে খুঁজিয়া বাহির করিবে। এক-একবার মনে হইত, ধরা দিয়া এমন সাহসী বীরের মর্যাদা রাখি।

বোম্বাই হইতে নাগপুর হইয়া আমরা মাদ্রাজে আসিলাম। সেখানে কিছুদিন থাকিয়া বিশাখাপত্তনম ও তৎপরে ওয়ালটেয়ারে উপস্থিত হইলাম। এখানকার সমুদ্রতীর আমার বিশেষ প্রীতিজনক বোধ হওয়ায় প্রায় দুই মাস তথায় অবস্থান করি। তারপর পুরী হইয়া কাশী যাই। কাশীতে বাঙালির সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। বেড়াইতে বাহির হইলে প্রায়ই বাঙালির সহিত সাক্ষাৎ হইত। আমার কেবলি ভয় হয়, কখন পরিচিত ব্যক্তির সহিত দেখা হয়, আর ধরা পড়িয়া যাই।

আমি একদিন রমেশদাকে বলিলাম, 'চল এখান থেকে যাই। চারিদিকে বাঙালি—ফস্ করে কবে চেনা-পরিচিত কেউ দেখে ফেলবে, তখনই মুস্কিল।' রমেশদা ইজিচেয়ারে লম্বা হাতলের উপর পা তুলিয়া নিশ্চিন্ত মনে চুরুট টানিতে টানিতে বলিলেন : 'মেয়েলি বুদ্ধি নিয়ে কি এহ শর্মারাম কাজ করে? জানিস এই কাশীতে যত বাঙালি আছে তার অধিকাংশই তোর রমেশদার দলের। কেহ বা কারো ঘরের বউ বের করে এনেছেন, কেউ বা বিধবা পোয়াতি খালাস করতে এসেছেন, কেহ আপন রক্ষিতা নারীর হাওয়া বদলাচ্ছেন—আবার এমন কেহ আছেন যাঁহারা নিজের আত্মীয়া দ্বারা পাপ ব্যবসায় করাচ্ছেন। বাংলার কলঙ্কের এই তিনটি স্থান—নবদ্বীপ, কাশী ও বৃন্দাবন। ভয় কচ্ছিস কাকে? কে কাকে নিন্দা করবে?

এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। পথের জনসঙ্ঘ কর্তৃক লাঞ্ছিত এক পতিতা নারী প্রভু যীশুখৃষ্টের আশ্রয় নিয়েছিল। যীশুখৃষ্ট সমবেত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমাদের মধ্যে যে নিষ্পাপ সে প্রথমে এই নারীর প্রতি লোষ্ট্র নিক্ষেপ কর। তখন কেহই অগ্রসর হইল না। বাইবেলে এই কথা আছে—মনে আছে?' আমি বলিলাম, 'হ্যাঁ, আছে। তুমি যেমন লোক, কাশী-বৃন্দাবন-নবদ্বীপকে সেই ভাবেই দেখছ। পুণ্যের দিক তোমার চোখে পড়বে কেন? তা যাই হউক, তবু চল। এখানে বেশিদিন থেকে কাজ নেই।'

আমরা এলাহাবাদ ও আগরা হইয়া মথুরায় গেলাম। প্রয়াগে গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে স্নান করিলাম। তাজমহল, আগরা ফোর্ট ও সেকেন্দ্রায় আকবরের সমাধি দেখিবার জন্য পাঁচদিন আগরায় বিলম্ব হইল। প্রায় পাঁচ মাস ঘুরিয়া আষাঢ় মাসের প্রথম ভাগে আমরা মথুরায় পেঁছিলাম। এখানে কিছু বেশিদিন থাকিবার ইচ্ছা। এত শহর থাকিতে মথুরার উপর রমেশদার এত মন পড়িল কেন, তাহা তখন বুঝিতে পারি নাই।

স্বামীঘাটের নিকটে যমুনার ধারে অল্প ভাড়ায় একটি ভাল বাড়ি পাওয়া গেল।

ক্যান্টন্‌মেণ্টের দিকে ইউরোপীয় ধরনের হোটেল একটি আছে বটে, কিন্তু সেখানে থাকা রমেশদার মত হইল না। টাকা ফুরাইয়া আসিয়াছিল, সাহেবি স্টাইল আর ত চলে না। রমেশদা বলিলেন, 'মথুরায় দেশীয়ভাবে থাকাই সুবিধাজনক।' তিনি কোট-প্যাণ্টুলন-টাই-টুপি ছাড়িলেন। আমার পোশাকে বিদেশিভাব তেমন কিছু ছিলনা। গোড়ালি-উঁচু জুতার বদলে আমি নাগরাই জুতা পরিলাম। রান্না করিবার জন্য বামুন ঠাকুর রাখা হইল। একটি চাকরও পাওয়া গেল—সে বাজার করিত, জল তুলিত, থালা-বাসন মাজিত।

একদিন দেখিলাম রমেশদা গোঁফ কামাইয়া ফেলিয়াছেন। আমি বলিলাম, 'ও কি রমেশদা, তোমায় ভাল দেখাচ্ছে না।' রমেশদা বলিলেন, 'ভাবনা কি—আবার গজাবে।'

কথাটা পরিহাসের বাতাসে উড়িয়া গেল। কিন্তু ব্যাপার এইখানে শেষ হইল না। আর একদিন দেখিলাম, রমেশদা এক নাপিত ডাকাইয়া মস্তক মুণ্ডিত করিলেন, মধ্যস্থলে একগোছা চুল শিখার মত রাখিলেন। আমার সন্দেহ হইল—ইহার মধ্যে কোনো মতলব আছে। তারপর যখন ললাটে, নাসিকায় চন্দনের তিলক-ছাপ দিয়া, কাছা-শূন্য কাপড় ও মাদ্রাজি জুতা পরিয়া রমেশদা একেবারে দ্রাবিড়ি পণ্ডিত সাজিলেন, তখন আমার আর বুঝিতে বাকি রহিল না যে রমেশদা আত্মগোপনের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু আমি মুখ ফুটিয়া কিছু বলিলাম না। সমস্ত ঘটনাটি হাসি-ঠাট্টার উপর দিয়াই শেষ হইল।

রমেশদা এক সময়ে রেঙ্গুনে থাকিতে মাদ্রাজি কথা শিখিয়াছিলেন। বৃন্দাবনে রঙ্গজীর মন্দিরে যাইয়া তিনি যখন স্বামীজী মহারাজের সঙ্গে আলাপ করিলেন, আমি আশ্চর্য হইয়া গেলাম। রামস্বরূপ আয়ার এই নামে রমেশদার চিঠি আসিত। অবশ্য অন্য শহরেও আমরা এযাবৎ ছদ্মনামে বাস করিয়াছি। কিন্তু এবারে রমেশদা যেন একটু বেশি সাবধান হইতেছেন। আমাকে এ সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেন নাই।

কলিকাতায় থাকিতেই রমেশদা বন্ধুদের সহিত মিশিয়া মদ্যপান অভ্যাস করিয়াছিলেন। আমি তাহা জানিতাম না। বাহিরে আসিয়া হোটেলে ইউরোপীয়ান স্টাইলে থাকার সময় মদ্যপানের মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইল। আমাকেও একটু-আধটু খাইতে তিনি অনুরোধ করিয়াছিলেন। আপত্তি করিয়া বলিলাম, 'না, বিশেষত দেহের এই অবস্থায়।' রমেশদা বলিলেন, 'সে এখনও ছয়মাস দেরি, তা বলে কি স্ফূর্তি মাটি করতে হয়?—আর তোমাদের আঁতুড় ঘরে যা খাওয়ানো হয়, সে 'ভাইনাম গ্যালিসিয়া'টা কি? সে ত খাঁটি এক্স নম্বর ওয়ান।' রমেশদার রোজই দু-এক গ্লাস চলিত। গন্ধটা আমার সহিয়া গিয়াছিল। কখনও কখনও বোতল হইতে আমিও ঢালিয়া দিতে বাধ্য হইতাম।

ইউরোপে তখন মহাযুদ্ধ। মথুরার ক্যাণ্টন্‌মেণ্টে অনেক গোরা পল্টন আসিয়াছে। চারিদিক হইতে সৈন্য সংগ্রহ ও রসদ যোগাইবার ব্যবস্থা। রমেশদা বলিলেন, 'মানু, আমি একটু ক্যাণ্টন্‌মেণ্টের দিকে যাচ্ছি, দেখি, যদি ভাল এক বোতল যোগাড় করতে পারি। এই শহরে কিছু পাওয়ার যো নাই। এরা কেবল সিদ্ধি ভাং নিয়েই ব্যস্ত।' রমেশদা বাহির হইয়া গেলেন। আমি বাড়িতে একাকী।

চাকর একখানি চিঠি দিয়া গেল। খুলিয়া দেখিলাম, কমলা লিখিয়াছে। চিঠিখানা পড়িয়া বজ্রাহত হইলাম। রমেশদা যে অফিসে চাকুরি করিত, তাহার তহবিল হইতে তিন হাজার টাকা চুরি করিয়াছে। চারি মাসের ছুটি লওয়ার কথা মিথ্যা। রমেশদার বিরুদ্ধে সেই কোম্পানি পুলিশের নিকট অভিযোগ করিয়াছে। গ্রেপ্তারি পরওয়ানা বাহির হইয়াছে। আমাকে অপহরণ করার অভিযোগ আমার পিতা না করিলেও আমার মামা (নন্দদার পিতা) জানাইয়াছেন। এই উপলক্ষ্যে পুলিশ আমাদের বাড়ি, মুকুলদার বাসা, কমলাদের বাড়ি, রমেশদার বোর্ডিং এবং রমেশদার বাড়ি অনুসন্ধান করিয়াছে। কমলার এবং মুকুলদার নিকট হইতে পুলিশ রমেশদার বোম্বাই ও কাশীর ঠিকানা পাইয়াছে। গোয়েন্দা পুলিশ রমেশদার পিছু লইয়াছে।

আমার শরীর ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। তারপর রমেশদার উপর আমার অমানুষিক ক্রোধ ও ঘৃণার উদয় হইল। আমি কিছু বুঝি না বলিয়া আমার সহিত এত প্রতারণা। আমি প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছি, বিশ্বাস করিয়াছি, তার প্রতিদান বুঝি এই জঘন্য ব্যবহার। আমি স্তব্ধ হইয়া রহিলাম।

সন্ধ্যার পরে রমেশদা আসিলেন। অতিরিক্ত মদ্যপানে তিনি মত্ত হইয়াছেন—চোখ দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম। আমি কঠোর স্বরে কহিলাম, 'রমেশদা তুমি যে চার মাসের ছুটি নিয়াছিলে, তার উপর আরও এক মাস হ'য়ে গেল, অথচ...'—আমার কথা শেষ না হইতেই রমেশদা জড়িত কণ্ঠে কহিল, 'সে কৈফিয়ত কি তোর কাছে দিতে হবে না কি? তুই কি আমার মনিব?' আমি বলিলাম, 'কৈফিয়ত চাহি না, কারণ ত আমায় বলতে পার।'

রমেশ। 'আমি আরও তিন মাসেব ছুটির দরখাস্ত করেছি। এইবার সন্দেহ মিটেছে।'

আমি। 'সন্দেহ নয় রমেশদা, তুমি জানো, হাতের টাকা সব ফুরিয়ে গেছে। আর এক সপ্তাহও চলবে না। যদি তুমি এখন কলকাতায় ফিরে না যাও, তবে অন্তত ছুটির মাসের বেতনটাও আনাতে পার। সেও তো আটশত টাকা হবে।'

রমেশ—'সে ভাবনা তোমায় করতে হবে না। সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাইটা দাও তো।'

আমি হুকুম তামিল করিয়া বলিলাম, 'রমেশদা, দেখছ তো আমার দেহের গতিক। এমন অবস্থায় কোন ভাল শহরে—যেখানে ভাল ডাক্তার অথবা প্রসূতি-হাসপাতাল আছে, এমন স্থানে না থাকিলে ভয় হয়। তাতেও অনেক টাকা খরচ হবে।'

রমেশদা টলিতে টলিতে খাটিয়ার উপর শুইয়া পড়িলেন। সিগারেট টানিতে টানিতে বলিলেন, 'টাকার আর ভাবনা কি মানু! দেখছিস ত এক থোকে আড়াই হাজার টাকা।' রমেশদা কাশিতে কাশিতে 'ওয়াক ওয়াক' করিতে লাগিলেন। আমি একটা বাটি সম্মুখে রাখিয়া বলিলাম, 'আড়াই হাজার কেন, তিন হাজার বল।' রমেশদা চক্ষু বিস্ফারিত করিলেন। তাঁহার বমির ভাব চলিয়া গেল।

আমি বলিলাম, 'রমেশদা, তুমি তিন হাজার যেভাবে পেয়েছ তা আমি জানি। সেই রকম রোজগারের আর এক কানাকড়িও আমি চাহি না। যদি ক্ষমতা থাকে, সৎপথে থেকে উপার্জন করে আমায় রাখ—চুরি-জোচ্চুরির পথে গিয়ে নিজে মজো না, আমায়ও মজিও না।'

রমেশদা নেশার ঘোরে বলিতে লাগিলেন, 'মানু, তোকে নিয়ে আমি সর্বত্যাগী হলুম, আর তুই আমায় চোর বলছিস? আমি কার জন্যে চুরি করেছি—কার জন্য স্ত্রীকে ছেড়েছি, মাকে ছেড়েছি, কার জন্য জেলে পা বাড়িয়েছি? যাঃচ্চলে, এই দুনিয়ায় দরদী কেউ নেই,প্রেমের মর্যাদা কেউ বুঝলে না। ও রে, চোর না হলে কেউ প্রেমিক হয় না। এই মথুরা তার সাক্ষ্য দিবে। বেশ, তুমি সাধুসজ্জন নিয়ে থাক, আমি এই মুহূর্তে চল্লুম।'

রমেশদা উঠিয়া টলিতে টলিতে জুতা পরিলেন, জামা গায়ে দিলেন। এ কি, সত্যই তিনি চলিলেন। আমি ছুটিয়া যাইয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিলাম, 'রমেশদা আমায় ছেড়ে যেওনা, আমার অপরাধ হয়েছে, ক্ষমা কর—আমায় অকূল সমুদ্রে ভাসিও না।'

রমেশদা এক লাথি মারিয়া আমাকে দূরে ফেলিয়া ক্রোধোন্মত্ত স্বরে চিৎকার করিয়া কহিলেন, 'চুপ রও শয়তানি, আমি তোমার কোনো কথা শুনতে চাই না। তোমার ধর্মজ্ঞান নিয়ে তুমি থাক।' নেশার ঘোরে তিনিও পড়িয়া যাইতেছিলেন। আমি তাড়াতাড়ি তাঁহাকে বিছানায় শোয়াইয়া মাথায় জল দিয়া বাতাস করিতে লাগিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁর খুব বমি হইতে লাগিল। বিছানা মেজে সব ভাসিয়া গেল। দুর্গন্ধে ঘর ভরিয়া উঠিল। বামুন ঠাকুর অথবা চাকর ইহারা কেহ কাছে আসিল না। আমি নিজেই বালতি করিয়া জল আনিয়া সমস্ত পরিষ্কার করিলাম। সে রাত্রিতে আমাদের কাহারও আহার হইল না। আমি তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিলাম। শেষ রাত্রিতে তাঁর খুব ঘাম

হইয়া দেহ একেবারে হিম হইয়া গেল। আমার বড় ভয় হইল। মানসিক উদ্বেগে দুশ্চিন্তায় সারা রাত্রি আমার ঘুম হইল না।

পরদিন বেলা নয়টার সময় রমেশদার চৈতন্য হইল। তাঁহাকে স্নান করাইয়া একটু গরম দুধ দিয়া কোকো তৈয়ারি করিয়া খাইতে দিলাম। কমলার চিঠিখানি তিনি আদ্যন্ত পড়িলেন। বুঝিলেন, ব্যাপার গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে।

আমাদের প্রণয়ের নির্মল আকাশে মেঘের সঞ্চার হইল। বিশ্বাসের স্থলে সন্দেহ আসিল। রমেশদাকে এক নূতন চক্ষে আমি দেখিতে লাগিলাম। তাঁহার চরিত্রের নানা দিক আমার সম্মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল—**লম্পট, চোর, বিশ্বাঘাতক, মিথ্যাবাদী, মাতাল।**

পঞ্চম

পাপের পথে

তারপর হইতে নানা খুঁটিনাটি লহয়া রমেশদার সহিত আমার প্রায়ই ঝগড়া হইতে লাগিল। হাতে নগদ টাকা যাহা ছিল, সমস্ত খরচ হইয়া গিয়াছে, মুকুলদার কাছে চিঠি দেওয়ায় তিনি পঞ্চাশ টাকা পাঠাইয়াছিলেন—তাহাও অতি কষ্টে। তিনি অল্প বেতনে সামান্য মাস্টারি করেন। সেই পঞ্চাশ টাকার মধ্যে আটাশ টাকা রমেশদা মদ খাইয়া উড়াইয়াছেন। দুর্ভাগ্য যখন আসে তখন এমনই হয়। বেতন না পাইয়া বামুন ঠাকুরটি চলিয়া গিয়াছে। দুই বেলা আমি রান্না করি। আমি রন্ধনকার্য জানিতাম না, কখনও শিখি নাই। অসুস্থ দেহ লইয়া আগুনের তাপে ও ধোঁয়ায় আমার প্রাণ যায় যায় হইয়া উঠিত।

মথুরায় একটা কাজকর্মের চেষ্টা দেখিতে বলিলাম, কিন্তু সেকথা রমেশদা গ্রাহ্য করিলেন না। শীতের জন্য এক সুট দামি পোশাক ছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া কিছু টাকা সংগ্রহ হইল। ক্রমে ক্রমে আমার গহনাগুলিও বিক্রয় করিলেন। আমার বিমাতা জন্মদিনের উপহার স্বরূপ আমাকে একছড়া সোনার হার দিয়াছিলেন, তাহা আমি বিক্রয় করিতে দিব না বলিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম। এই অপরাধে আমার উপর খুব মার-ধর ও বকুনি হইল। আজকাল কথায় কথায় লাথি, চড়-থাপড় এসব আমার ভাগ্যে জুটিত। আমি কেবল কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহা সহ্য করিতাম।

রমেশদা আমাকে বলিলেন, 'কমলাকে কিছু পাঠাইতে চিঠি লেখ।' আমি বলিলাম, কমলা 'দরিদ্র ঘরের মেয়ে, সে টাকা পাইবে কোথায়?' ইহা লইয়া রমেশদা আমার উপর খুব রাগ করিলেন। আমি অগত্যা কমলাকে চিঠি লিখিলাম। সে কুড়ি টাকা পাঠাইল। তাহাও কয়েকদিনেই ফুরাইয়া গেল।

আমার দুই একখানা দামি কাপড় ও গহনা তখনও ছিল। রমেশদা নানা কৌশলে তাহা আমার নিকট হইতে নিয়া বিক্রয় করেন। কেবল সেই সোনার হারছড়া তখনও আমি দিই নাই। একদিন তিনি আসিয়া বলিলেন, `মানু, বৃন্দাবনে প্রেম-মহাবিদ্যালয়ে একটা প্রফেসারি

কাজ পেয়েছি। রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। লোকটা ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ভয়ানক বিরোধী। আমারও সেই ভাব তুমি তা জানই। রাজা খুব খুশি হলেন। আমাকে এখন মাসিক একশত টাকা বেতন দিবেন।' আমি শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম।

রমেশদা চিন্তাকুল চিত্তে কহিলেন, 'একসুট পোশাক তৈয়ারি করা দরকার, কিন্তু টাকারই তো অভাব।' আমি বলিলাম, 'আমার সোনার হারছড়া বাঁধা রেখে কিছু টাকা ধার কর, তারপর এক মাসের বেতন পেলেই ছাড়িয়ে আনতে পারবে।' রমেশদা মুখ ফিরাইয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'না, তাও কি হয়, তোমার সৎমার স্নেহের উপহার।' আমি বুঝিলাম, সেদিনের ব্যাপারে আমার উপর এ অভিমান ও শ্লেষ। আমি তখনি আমার হাতবাক্স খুলিয়া রমেশদার কোলের উপর হারটা ফেলিয়া দিলাম। সেই হার বন্ধকে পাওয়া দেড়শত টাকা রমেশদার হাতেই খরচ হইয়াছে। অথচ প্রফেসারি চাকুরির জন্য যে একসুট পোশাক তৈয়ারি করিবার কথা ছিল তাহা হয় নাই।

আমার সন্দেহ হইল, চাকুরির কথা মিথ্যা। আমার শেষ সম্বল হারছড়া হস্তগত করিয়া তাহা দ্বারা মদের মূল্য সংগ্রহ করাই রমেশদার উদ্দেশ্য ছিল। আমি একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কবে থেকে প্রফেসারি আরম্ভ করবে।' রমেশদা বেশ চতুরতার সহিত উত্তর করিলেন, 'রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ হঠাৎ বৃন্দাবন ছেড়ে চলে গেছেন। গভর্নমেণ্ট তাঁর গ্রেপ্তারি পরওয়ানা বাহির করেছে। এই ত হয়েছে এখন মুস্কিল।' পাছে আমার সন্দেহ হয় সেইজন্য 'হিন্দু' নামক সংবাদপত্র হইতে পড়িয়া আমাকে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ বিষয় শুনাইলেন।

মথুরায়, বৃন্দাবনে তখন ঝুলনের উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। আমি রমেশদাকে বলিলাম, 'চল, একবার দ্বারকাধীশের মন্দিরে যাই।' তিনি বলিলেন, 'না, আমার শরীরটা ভাল লাগছে না। তুমি লছমনকে সঙ্গে নিয়ে যাও।' লছমন আমাদের চাকরের নাম। আমি বাহির হইয়া গেলাম। রমেশ বাড়িতে রহিলেন।

ঝুলনের সময় মথুরার মন্দিরে খুব আমোদপ্রমোদ হয়। দ্বারকাধীশের মন্দিরেই সর্বাপেক্ষা বেশি। স্বর্ণরৌপ্য মণ্ডিত বৃহৎ সিংহাসনে ঠাকুরকে বসাইয়া দোলানো হয়। সমস্ত মন্দির আলোক, পুষ্পপত্র, পতাকায় সুসজ্জিত হইয়া এক অপূর্ব শ্রী ধারণ করে। গায়কগণ সুললিত স্বরে ভজন গানে রত থাকেন। এই সকল দর্শন করিলে নানা দুঃখ ও বিপদের মধ্যেও শান্তির ভাব আসে।

আমরা বিশ্রামঘাটের আরতি এবং আরও দুই-তিনটি মন্দিরে ঝুলন দেখিয়া রাত্রি প্রায় ৯টার সময় বাড়িতে ফিরিলাম। ঘরে যাইয়া দেখি রমেশদা নাই। আলো জ্বলিতেছে। শোবার খাটিয়ার উপরে একখানি চিঠি রহিয়াছে। পড়িয়া দেখিলাম তাহাতে এরূপ ভাবের লেখা ছিল :

'মানু তোমার সঙ্গে আর থাকা যায় না। তুমি আমায় চোর, লম্পট, মাতাল বলে ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছ। যেখানে ঘৃণা ও সন্দেহ, সেখানে ভালবাসার স্থান নাই। আজ আমি

তিন হাজার টাকা অফিসের ক্যাশে গুঁজে দিলেই আমার চোর অপবাদ ঘুচবে—আরও দু-চার-দশটা মেয়ে বের করলেও আমি সমাজে বুক ফুলিয়ে বেড়াব—আর মদ্যপান, সে তো বড়লোকের লক্ষণ। তুমি নিজের ভাল বুঝলে না। তোমার আর উদ্ধার নাই। দেখব তোমার নবজাগ্রত নীতিজ্ঞান তোমাকে কত দূর রক্ষা করে। আমি চললাম—আমায় খুঁজো না। পুলিশ আমার পিছু নিয়েছে। তুমি অবিলম্বে এই বাড়ি ছেড়ে যেও।'

আমার হঠাৎ মনে হইল, একটা পর্বতপ্রমাণ বোঝা যেন আমার মাথার উপর হইতে সরিয়া গেল। ডুবিতে ডুবিতে আমি যেন জলের উপরে নাক তুলিয়া একটু নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। রমেশদার ব্যবহার আমার এত অসহ্য হইয়াছিল। আমি স্বাধীনতা চাহিয়াছিলাম, ভগবান বুঝি তাহারই পথ খুলিয়া দিলেন।

রাত্রিতে রান্না-খাওয়া হইল না। গভীর রাত্রিতে আমার মনে নানা দুশ্চিন্তা আসিল। এখন কি করি, কোথায় যাই। ভাবিলাম, দুর্বলচিত্ত হইলে চলিবে না। অনিদ্রায় রাত্রি কাটিল। সকালে উঠিয়া চারিদিকে চাইতেই রমেশদার জন্য দুঃখ হইল। চা তৈয়ারি করিলাম না। লছমনকে ডাকিয়া বলিলাম, 'আমি বৃন্দাবনে যাব, একখানি এক্কা অথবা টাঙা ঠিক করে দাও।'

আমার গহনার মধ্যে হাতে দু গাছা সোনার চুড়ি ও কানে একজোড়া দুল মাত্র অবশিষ্ট ছিল। সে সমস্ত বিক্রয় করিয়া চাকরের তিন মাসের বেতন চুকাইয়া দিলাম। আমার হাতে কিছু টাকাও রহিল।সেই সময়ে কমলার একখানি চিঠি পাইলাম। সে লিখিয়াছে, 'রমেশবাবুর সঙ্গে পলায়ন করা তোমার ভুল হইয়াছে। এ প্রকার প্রেমেব মিলন যেমন হঠাৎ এসে পড়ে, বিচ্ছেদও তেমনি হঠাৎ হয়ে যায়। তোমাদের উভয়ের বিবাহে এমন বিশেষ-কিছু বাধা ছিল না। তোমার পিতারও বোধ হয় অমত হত না। এখনও তুমি ফিরে এসে ভ্রম সংশোধন করতে পার।'

কমলার উপদেশ আমার ভাল লাগিল না। তাহার পত্রের কোনো উত্তর দিলাম না। বৃন্দাবনে যাইয়া সেবাকুঞ্জের নিকটে একখানি ছোট ঘর ভাড়া লইলাম। তাহার আশেপাশে আরও অনেক বাঙালি বাস করিত, তাহাদের প্রায় সকলেই অধিক বয়সের বিধবা। আমি তাহাদিগকে বললাম, 'মথুরায় থাকিতে আমার স্বামী ও শাশুড়ির কলেরায় মৃত্যু হইয়াছে। দেশে আত্মীয়স্বজনের নিকট চিঠি লিখিয়াছি।' সকলেই আমার জন্য দুঃখপ্রকাশ করিল।

এক মাস পরে আমি এই ঘর ছাড়িয়া বংশীঘাটের নিকট যাইয়া বাস করিতে লাগিলাম। হাতের সামান্য টাকা ফুরাইয়া আসিয়াছিল। ইতিমধ্যে একবার জ্বর হইয়া প্রায় দশ দিন ভুগিয়াছিলাম। ভিক্ষা করিতে পারিলে আহারের অভাব হয় না, কিন্তু আমার শরীর এত দুর্বল হইয়াছিল যে চলিতে পারিতাম না।

দুই দিন কিছু খাই নাই। ভিক্ষা চাহিতে জানি না। বংশীঘাটের নিকট রাস্তার ধারে শুইয়া আছি। ভাবিতেছি, এখন মরণ আসিলেই বাঁচি। একজন বাঙালি ভদ্রলোক যাইতেছিলেন, তিনি আমার দুরবস্থা দেখিয়া দয়ার্দ্র হৃদয়ে আমাকে সঙ্গে লইয়া গেলেন। ইনি এক সাধু

মোহান্তের শিষ্য। মোহান্তজীর বৃহৎ আশ্রম—তাহাতে দেববিগ্রহ ও বহু শিষ্যসেবকাদি রহিয়াছে। মোহান্তজী বাঙালি। তাঁহার বয়স প্রায় ৬৫, মস্তকে জটা, আবক্ষলম্বিত দীর্ঘ শ্মশ্রু, অঙ্গে চন্দনবিভূতি। তিনি আসনে বসিয়াছিলেন। আমাকে দেখিয়া শিষ্যকে বলিলেন, 'একে নিয়ে এসেছ কেন? এ যে অন্তঃসত্ত্বা। কোনো দুষ্ট লোকের প্ররোচনায় পালিয়ে এসেছে, এখন সেই লোকটি সরে পড়েছে। এর অনেক কষ্টভোগ আছে। আচ্ছা, কিঞ্চিৎ ঠাকুরের প্রসাদ একে দাও।'

আমি একটু সুস্থ হইলে তিনি আমাকে বলিলেন, 'মা, আমার এই আশ্রমে তো স্ত্রীলোক রাখবার নিয়ম নাই। বিশেষত তুমি গর্ভবতী, সম্মুখে অনেক বিপদ। তুমি এখন কি করবে বল।' আমি কাঁদিয়া তাঁহার পা জড়াইয়া বলিলাম, 'বাবা, আমি মহাপাপী, আমায় উদ্ধার করুন। আপনি তো মনের কথা সবই জানেন।' মোহান্তজী বলিলেন, 'হাঁ, আমি সব জানি। তোমার মনের কথা তুমি যাহা না জান আমি তাহাও জানি। এই অনুতাপ ক্ষণস্থায়ী ও অপ্রকৃত। কামপ্রবৃত্তি একবার হৃদয়ের মধ্যে শিকড় গজাইয়া উঠিলে আর রক্ষা নাই। দুঃখ-দারিদ্র্য, রোগশোকে, সাময়িক বিচারবুদ্ধিতে সেই পাপবৃক্ষকে মাঝে মাঝে ছেদন করিয়া দেয় ; কিন্তু আবার অনুকূল অবস্থায় নূতন অঙ্কুর জন্মে। একমাত্র ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত এই প্রলোভনকে স্থায়ীরূপে জয় করা যায় না। ইহার জন্য কঠোর সাধনার প্রয়োজন।

আমি অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলাম, 'আমায় ক্ষমা করুন, আমায় আশ্রয় দিন।' মোহান্তজী স্নেহপূর্ণ স্বরে কহিলেন 'মা, অন্নবস্ত্র দেওয়ার দয়া তুমি অনেক পাবে। সেই দয়ার অভাব সংসারে নাই। তোমাকে এখন যে আক্রমণ করেছে সে দারিদ্র্য নহে, সে, তোমার দুর্দমনীয় প্রবৃত্তি। সেই আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার আশ্রয় তো তুমি চাও না, তোমার প্রার্থনা অন্নবস্ত্র ও বাসগৃহ। আচ্ছা, তুমি ঘরে ফিরে যাবে?'

আমি সম্মতি জানাইলে তিনি আমার পিতার নাম-ঠিকানা লিখিয়া লইলেন। পরে শিষ্যকে ডাকিয়া বলিলেন, 'কলিকাতায় চিঠি লেখ। আশ্রমের পাশের বাগানে রামকিষণ তাহার স্ত্রী ও দুটি ছেলে নিয়ে আছে। তাদের সঙ্গে এ স্ত্রীলোকটিও থাকবে। সব ঠিক করে দাও।' শিষ্য চলিয়া গেলে তিনি আমাকে বলিলেন, 'তোমার পিতা পুনরায় গ্রহণ করবেন বলে আমার মনে হয় না। তাঁকে তো সমাজ মেনে চলতে হচ্ছে। পাপ-প্রলোভনের বশীভূত হওয়া একটা আধ্যাত্মিক ব্যাধি। প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা খণ্ড [ন] না হলে চিত্ত কিছুতেই ঈশ্বরাভিমুখী হতে পারে না।'

রামকিষণের পরিবারের সহিত আমি আশ্রমের বাগানে বাস করিতেছি। রামকিষণ বাগানের তত্ত্বাবধান করে। প্রত্যহ গোয়ালঘর পরিষ্কার করা, তিনটি গাভী ও কয়েকটি বাছুরকে খৈল-ভূষি খাওয়ানো, দশ-বারো কলসি জল ইন্দারা হইতে তুলিয়া বাগানে দেওয়া, ঠাকুরের ভোগ রান্না করিবার পাত্রাদি মাজা, সাধুদের ভোজন হইয়া গেলে সেই স্থান পরিষ্কার করা, আমার নিজের আহারের জন্য গম পিষিয়া লওয়া আমার নিত্য

কর্তব্যরূপে নির্ধারিত হইয়াছিল। আমি সন্তুষ্টচিত্তে এই সকল কার্য করিতাম। কিন্তু আমার বড় পরিশ্রম বোধ হইত। মোহান্তজীর নির্দেশ অনুসারে আমার মাথায় চুল ছোট করিয়া কাটিয়া ফেলা হইয়াছিল। কেবলমাত্র প্রভাতে মঙ্গল-আরতির সময় আমি মন্দিরপ্রাঙ্গণে যাইবার অনুমতি পাইয়াছিলাম। মোহান্তজী বাগানে আসিলে প্রয়োজনমত আমার সহিত কথাবার্তা বলিতেন।

একমাস পর আমার পিতার চিঠি আসিল। তিনি মোহান্তজীকে জানাইয়াছিলেন যে তিনি আমাকে গ্রহণ করিতে পারিবেন না। এমন কন্যাকে তিনি মৃতার ন্যায় জ্ঞান করেন। তখন তর্ক করিবার বুদ্ধি আমার ছিল না। আমার শরীর ও মন দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু আজ আমি পিতার কথার উত্তর দিতে পারি। আমার এই আত্মচরিত লেখা আরম্ভ করিবার কিছুদিন পূর্বে গত ঝুলনের সময় আমি বৃন্দাবনে গিয়াছিলাম। সেখানে মোহান্তজীর সঙ্গে আমি পুনরায় সাক্ষাৎ করি। তাহার বিবরণ যথাস্থানে লিখিব। তখন তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, 'বাবাজী, আমি মহাপাপী, সমাজে আমার স্থান নাই, পিতা আমায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার মত পাপরতা, পতিতা নারীর পদতলে যে সকল পুরুষ তাহাদের মানমর্যাদা-অর্থসম্পত্তি-দেহমন বিক্রয় করেছে, ওই দেখুন, তাদের সমাজ মাথায় তুলে রেখেছে—তারা কবি ও সাহিত্যিক বলিয়া প্রশংসিত, রাজনীতিক ও দেশসেবক বলিয়া বিখ্যাত, ধনী প্রতিপত্তিশালী বলিয়া সম্মানিত। এমন কি অনেক ঋষি-মোহান্তও গুরুগিরি ফলাইয়া সমাজের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত আছেন, তাহা সমাজ জানিয়া-শুনিয়া নীরব। কোর্টে, কাউন্সিলে, করপোরেশনে, গুরুগিরিতে কোথাও তাদের কোনো বাধা নাই। আর আমরা কবে বালিকা বয়সের নির্বুদ্ধিতার জন্য এক ভুল করেছিলাম তার ফলে এই বারো বৎসর ধরে জ্বলে-পুড়ে মরছি। এই ত আপনাদের সমাজের বিচার।'

তিন মাস অতীত হইয়া গেল। একদিন মোহান্তজী বাগানে আসিলে রামকিষণ তাঁহাকে বলিল, 'বাবা, এ যে পোয়াতী মেয়ে, এত খাটুনিতে পেটের ছেলেটার কোনো কিছু না হয়।' আমি তখন নিকটেই বসিয়া গোবরের ঘুঁটে তৈয়ার করিতেছিলাম। মোহান্তজী বলিলেন, 'পেটের ছেলে কি আর বেঁচে আছে! এখন কোনোরূপে প্রসব হয়ে গেলে ভাল। এইটুকু পরিশ্রম না করলে শরীর খারাপ হয়ে যাবে যে।' রামকিষণ আশ্চর্য হইল। মোহান্তজী বলিলেন 'মেয়েটার দেহে কুৎসিত ব্যাধি প্রবেশ করেছে। প্রবৃত্তির উত্তেজনায় মানুষ স্বাস্থ্যবিধিও ভুলে যায়।'

যথাসময়ে আমি একটি মৃত পুত্র প্রসব করিলাম। রামকিষণের স্ত্রী আমার সেবাশুশ্রূষায় রত হইল। এই সরলপ্রকৃতি অশিক্ষিতা কৃষকরমণীর মাতৃসম স্নেহের কথা আমার চিরদিন মনে থাকিবে। কিছুদিন পরে যখন পুনরায় বৃন্দাবনে গিয়াছিলাম তখন রামকিষণের স্ত্রীর খোঁজ করিয়াছিলাম। কিন্তু শুনিলাম, আমি যাইবার আট মাস পূর্বে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

সন্তানপ্রসবের পর আমার নানা রোগ দেখা দিল। কিছু খাইতে পারিতাম না। সন্ধ্যার

সময় অল্প জ্বর হইত। সঙ্গে সঙ্গে পেটের অসুখ। আমি একেবারেই শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলাম। মোহান্তজী যথাসম্ভব আমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রায় চারি মাস ভুগিযা আমি কিঞ্চিৎ সুস্থ হই। এই সময়ে একদিন রাত্রিশেষে আমি বিছানায় পড়িয়া মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছিলাম। আমার মনে হইল আমি যেন আমাদের কলিকাতার বাড়িতে আছি। মা আমার কাছে বসিয়া আমার মাথায় হাত বুলাইতেছেন। আমি ঘুমের ঘোরে বলিলাম, 'মা তোমরা যে থিয়েটারে যাবে, আমায় সঙ্গে নিয়ে চল।' মা বলিলেন, 'না তুই এখন ছেলে মানুষ।' তারপর কে আসিয়া মাকে ডাকিল, মা উঠিয়া গেলেন। আমি চিৎকার করিয়া বলিলাম, 'মা গো আমায় নিয়ে যাও'—রামকিষণের স্ত্রী পাশের ঘর হইতে ছুটিয়া আসিল। আমি তখন কাঁদিয়া বলিতেছি, 'মা গো, আমায় নিয়ে যাও গো।' এই স্বপ্নের কথা আমি মোহান্তজীকে বলিয়াছিলাম। তিনি শুনিয়া বলিলেন, 'তোমাকে আরও অনেক ভুগতে হবে।' আমি দীক্ষা গ্রহণ করিতে চাহিলাম। তিনি বলিলেন, 'মা, আমি দৈবকে অতিক্রম করিতে পারি না। দীক্ষা নেবার তোমার এখনও সময় হয় নাই।'

আরও ছয়-সাত মাস গেল। আমার আশ্রমবাস প্রায় এক বৎসর হইল। শরীর একটু ভাল হইয়াছে, এখন শ্রমের কার্যও নিয়মিত করিতে পারি। মোহান্তজীর শিষ্যদের মধ্যে কেহ কেহ নির্দিষ্ট সময়ে বাগানে যাইয়া ঠাকুরের ভোগের জন্য তরিতরকারি ফলমূল শাকসবজি লইয়া আসিতেন। ইঁহাদের একজনের সহিত কোনো কথা প্রসঙ্গে আমার কুদৃষ্টি দূর হইতে মোহান্তজী লক্ষ করেন। আমি যদিও তাঁহার প্রতি কুভাবে আসক্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু তিনি ছিলেন নির্মলচরিত্র। তবু তদবধি তাঁহাকে আর বাগানে পাঠানো হইত না।

আমি এক দীর্ঘ প্রেমপত্র লিখিয়া তাঁহাকে দিবার জন্য এক দিন বেলা প্রায় দুইটার সময়ে আশ্রমে প্রবেশ করি। জানিতাম তখন মোহান্তজী তাঁহার আসনে ধ্যানস্থ থাকেন। আশ্রমপ্রাঙ্গণে একটি বৃহৎ বৃক্ষের তলায় আমি দাঁড়াইয়াছিলাম। হঠাৎ দেখিলাম, মোহান্তজী আমার দিকে আসিতেছেন। আমি ভীত হইলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ সময়ে তুমি আশ্রমে এসেছ কেন? এখন তোমার আসিবার কথা নয়।' আমি ইতস্তত না করিয়া তখনই উত্তর দিলাম, 'শ্যামলী বাছুরটা এইদিকে ছুটে এসেছে।' মোহান্তজী গম্ভীর স্বরে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, 'বাহিরে যাও, বাছুর এখানে আসে নি। এলেও সে রামকিষণের কাজ, তোমার নয়—'।

পরদিনই মোহান্তজী আমাকে ডাকিলেন। আমি সভয়ে তাঁহার সম্মুখীন হইলাম। তাঁহার নিকটে আর-একজন প্রৌঢ় বাঙালি ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন। মোহান্তজী আমাকে বলিলেন, 'তোমাকে আজই এই ভদ্রলোকটির সঙ্গে কলিকাতায় যেতে হবে। সেখানে ইনি তোমার সকল ব্যবস্থা করে দিবেন।' আমি মনে মনে সুখী হইলাম।

মোহান্তজী সাংসারিক জীবনে একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ছিলেন। সেই সূত্রে তাঁহার অনেক বন্ধু বৃন্দাবনে যাইয়া তাঁহার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ ও ধর্মালোচনা করিতেন। যে

ভদ্রলোকটির সঙ্গে আমি কলিকাতায় আসিলাম, তিনি মোহান্তজীর বন্ধু। তাঁহার গৃহে আমি প্রায় দশ দিন অবস্থান করি।

কলিকাতা নগরের উপকণ্ঠে কোনো স্থানে শ্রীযুক্ত....দাস একটি নারী উদ্ধার আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি একজন আইন ব্যবসায়ী। দেশকর্মী বলিয়া প্রসিদ্ধ। মোহান্তজীর বন্ধু সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি আমাকে নারী উদ্ধার আশ্রমে রাখিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত দাসের সহিত ইহার বিশেষ পরিচয় ছিল।

আমার জীবনের ইতিহাসের এক অধ্যায় শেষ হইল। পিতার অনাদর, কুশিক্ষা ও কুসংসর্গ আমাকে পাপের পথে আনিয়াছে। আমি কখনও সংযম শিখি নাই। প্রবৃত্তির অনলে কেবল ইন্ধন যোগাইয়াছি। গল্প-উপন্যাস পাঠ করিবার ফলে সমাজশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ভাবই কেবল আমার মনের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়াছে। উত্তেজনার বশে কার্যের পরিণামের দিকে দৃষ্টি যায় নাই।

পতিতা নারীদের মধ্যে যাহারা এইরূপে পরপুরুষের অবৈধ প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া কুপথে আসে, তহাদের সকলের ভাগ্যেই এই দশা ঘটে। সেই পুরুষটি অবোধ বালিকার সর্বনাশ করিয়া অল্পসময়ের মধ্যেই তাহাকে ছাড়িয়া যায়। এমন কোনো পতিতা নারী নাই, যে আমরণ তাহার প্রথম প্রণয়ীর সহিত বাস করিতেছে।[২] অভিজ্ঞতা হইতে ইহাব যুক্তিসঙ্গত কারণ আমি দেখাইয়া দিতেছি।

অবৈধ প্রেম উত্তেজনার বশেই জন্মে।[৩] উত্তেজনামাত্রই ক্ষণস্থায়ী ও তাহা কদাচ বিচারবুদ্ধি প্রসূত নহে। সুতরাং যে প্রেম অল্পতেই জন্মে, তাহা অল্পেতেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই প্রকার অবৈধ প্রেমে মিলিত নারী পুরুষের বিচ্ছেদের কারণ একের বা উভয়ের দোষ, অথবা অবস্থার পীড়ন। অর্থাভাব, গর্ভসঞ্চার, রূপ-বিকৃতি—এই সব হইল অবস্থার পীড়ন। মদ্যপানের অভ্যাস, অপরের প্রতি আসক্তি এই সব হইল নারী- পুরুষের দোষ।

আমাদের ব্যাপারে দুই ঘটিয়াছিল। রমেশদার মদ্যপান ও আমার অসময়ে সন্তান সম্ভাবনা আমাদের বিচ্ছেদের কারণ। যদি রমেশদা হিন্দুর সামাজিক রীতি অনুসারে আমাকে বিবাহ করিয়া আমার স্বামী হইতেন, তবে তিনি কখনই আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। আর কিছু না হউক, শেষকালে একটা আইনের ভয়ও থাকিত—লোকলজ্জা ও সমাজ শাসন না হয় ছাড়িয়াই দিলাম।[৪] অবৈধ প্রেমে যেমন মিলনের স্বাধীনতা আছে, তেমনি বিচ্ছেদের স্বাধীনতাও আছে। তাই রমেশদা অনায়াসে আমাকে ছাড়িয়া গেলেন। সমাজ আজ রমেশদাকে প্রশংসাই করিবে। আমিই হইয়াছি নিন্দার ভাগী। রমেশদা আমাকে শেষ কথা সত্যই বলিয়া গিয়াছেন।

তারপর এত দুঃখ ভোগ করিয়াও আমার শিক্ষা হয় নাই। মোহান্তজীর আশ্রমে এমন পুণ্যের বাতাসের মধ্যে থাকিতেও দুষ্প্রবৃত্তির অঙ্কুর আবার আমার হৃদয়ে দেখা দিয়াছে। শয়তানের প্রলোভন সুখস্বর্গের ছবি লইয়া সম্মুখে আসিল। আমি তাহাতে মুগ্ধ হইলাম।

ষষ্ঠ

দেহ বিক্রয়

যে সকল স্ত্রীলোক পাপ পথ ছাড়িয়া সদ্ভাবে জীবন যাপন করিতে ইচ্ছুক, তাহারা এই উদ্ধার আশ্রমে স্থান পাইত। কোনো প্রকার শিল্পকার্যাদির দ্বারা জীবিকা অর্জনের উপায় তাহারা অবলম্বন করিত। আবার এমন স্ত্রীলোকও সেখানে ছিল, যাহারা নিতান্ত দায়ে পড়িয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে। উহারা আমার মত এইরূপ ঘটনাচক্রে জড়িত, সমাজ অথবা পরিবারে তাহারা যাইতে পারে না। তাহাদের জীবনের গতি অস্থির। উদ্ধার আশ্রমে খাওয়া-পরা পাইয়াই যে তাহারা সুখী, আমার তাহা বোধ হইল না। ইহাদের সকলেই কিশোরী বা যুবতী। আমি যখন সেখানে গিয়াছিলাম, তখন প্রায় ১৩।১৪ জন স্ত্রীলোক ছিল, তন্মধ্যে জন-পাঁচেক প্রৌঢ়া বিধবা ব্যতীত আর সকলেই এই শ্রেণির।

আমি ক্রমশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম, যে সকল স্ত্রীলোক স্বেচ্ছায় বা কুলোকের প্ররোচনায় ঘরের বাহির হইয়া আসে, অন্নবস্ত্রের অভাবই তাহাদের প্রধান বিপদ নহে। 'কী খাইব' এই চিন্তা অপেক্ষা 'কিরূপে থাকিব' এই ভাবনাই তাহাদের বেশি করিতে হয়। কলিকাতা শহরে স্ত্রীলোকেরা নানাপ্রকার ব্যবসায় ও চাকুরিতে নিযুক্ত হইতে পারে। তাহাতে গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত অর্থ উপার্জন করা যায়। কিন্তু আমি দেখিয়াছি, ওই সকল ব্যবসায় ও চাকুরি যে সকল স্ত্রীলোক অবলম্বন করিয়াছে তাহাদের মধ্যেও অনেকে প্রায় পতিতা নারীর পথে চলিতেছে। ইহার কারণ, তাহারা কখনও বিবাহিত জীবনের সংযমের মধ্য দিয়া আসে নাই। পানওয়ালি, মেস-বেডিং-হোটেলের বা গৃহস্থ বাড়ির ঝি-চাকরানি, বাজারের মাছ-তরকারি-ফলমূল-প্রভৃতি বিক্রয়কারিণী, রাঁধুনি, কারখানার মজুরানি, মশলা-ঝাড়াইওয়ালি, থিয়েটারের অভিনেত্রী, কীর্তনওয়ালি, শুশ্রূষাকারিণী, সংগীত-শিক্ষয়ত্রী, প্রসবকারিণী দাই, মেয়ে ডাক্তার, রেলের টিকিট-অফিসে ও টেলিফোনের মেয়ে কেরানি—ইহারা সকলেই স্বীয় জীবিকানির্বাহের উপযুক্ত অর্থ উপার্জন করিতে পারে এবং ইচ্ছা করিলে পবিত্র জীবন যাপন করিতে পারে ; কিন্তু তাহা সকল সময়ে হয় না। বহুদিনের অভিজ্ঞতায় আমি একথা বলিতেছি।

উদ্ধার আশ্রমের কর্তৃপক্ষদের নিকট আমি পিতার পরিচয় ও ঠিকানা সমস্তই গোপন করিয়াছিলাম। তাঁহারা শুধু জানিলেন, আমি উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণের মেয়ে। কুমারী অবস্থায় কোন দুষ্ট লোক আমাকে ঘরের বাহির করিয়া আনিয়াছিল। সে গর্ভাবস্থায় আমাকে ছাড়িয়া পলাইয়াছে। রমেশদার নামও আমি প্রকাশ করিলাম না। আমি লেখাপড়া কিছু জানি, ইহা প্রকাশ হইল।

বৃন্দাবন হইতে কলিকাতায় আসিতে আমার খুব আগ্রহ জন্মিয়াছিল। তাহার কারণ, আমি আশা করিয়াছিলাম, আর যাহাই হউক অন্তত মুকুলদা ও কমলাকে দেখিতে পাইব।

অকূল সমুদ্রে এই দুইটি বন্ধু আমার তৃণস্বরূপ। কিন্তু উদ্ধার আশ্রমে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তাহাদের খবর পাওয়া সহজ ব্যাপার নহে।

শীঘ্রই কয়েকটি সমবয়সি মেয়ের সঙ্গে আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। ইহাদের মধ্যে রাজবালা ও হরিদাসী এই দুইজন ছিল প্রধান। ইহাদের কথা এই পুস্তকের স্থানে স্থানে আরও কয়েকবার উল্লেখ করা হইবে। সুতরাং ইহাদের একটি পরিচয় দিতেছি। রাজবালা সোনারবেণের মেয়ে। বাপের বাড়ি কলিকাতায়, অল্প বয়সে তার বিবাহ হইয়াছিল। পিতা ও শ্বশুর উভয় পরিবারই সঙ্গতিপন্ন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বিবাহের এক বৎসর পরেই হতভাগিনী বিধবা হয়। তৎপরে পিতার প্রতিবেশী এক পূর্ববঙ্গবাসী কায়স্থ যুবকের সহিত তাহার গুপ্ত প্রণয় জন্মে। রাজবালার এক জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ এই ব্যাপারে তাহাকে গোপনে সাহায্য করিত। যুবকটি স্বদেশি আন্দোলনের সময় খুব 'বন্দে মাতরম্' করিয়া বেড়াইত। তিন বৎসর ধরিয়া এই গুপ্ত প্রেমলীলা চলিতে থাকে। অবশেষে রাজবালার সন্তানসম্ভাবনা হওয়ায় প্রেমিক যুবক পলায়ন করে। রাজবালা ঝিয়ের সহিত গঙ্গাস্নানের অছিলায় বাড়ির বাহির হইয়া আসে, আর সে ফিরিয়া যায় নাই। তারপর নানা দুঃখদুর্দশার আবর্তে ঘুরপাক খাইতে খাইতে এই উদ্ধার আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছে।

কালিদাসী সধবা, কামারের মেয়ে। সে রূপসী ছিল। বর্ধমান জেলার কোনো পল্লীগ্রামে তাহার শ্বশুরঘর। স্বামীর নিকট হইতে দুর্বৃত্তেরা তাহাকে বলপূর্বক অপহরণ করে। তাহারা এক বৎসর ধরিয়া তাহাকে নানা স্থানে ঘুরাইয়া বেড়ায়। ইহা লইয়া মামলা-মোকদ্দমা হইয়াছিল। কিন্তু মোকদ্দমার পরে কালিদাসীর স্বামী তাহাকে গ্রহণ করিল না। তাহার এক আত্মীয়ের পরামর্শে সে পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করিতে যাইতেছিল। বর্ধমান শহরের কোনো উকিল জানিতে পারিয়া তাহাকে এইখানে পাঠাইয়া দেন।

ক্রমশ বুঝিতে পারিলাম, উদ্ধার আশ্রমটি আমাদের পক্ষে নিরাপদ স্থান নহে। অন্নবস্ত্রের কোনো ক্লেশ নাই। আমাদের মধ্যে যাহারা রূপযৌবনসম্পন্না, তাহাদের প্রতি কর্তৃপক্ষের মধ্যে কাহারও কাহারও একটু বিশেষ দৃষ্টি। আমার উপর তাঁহাদের শীঘ্রই অনুগ্রহ পড়িল। আমাকে কাজকর্ম করিতে হইত না। আমার থাকিবার ঘর বিবিধ আসবাবপত্রে সজ্জিত হইল। আমি অতিশয় প্রীত হইলাম। আমার ভাল কাপড়চোপড়, দামি জামাসেমিজ, পরিপাটি বিছানা। অন্যান্য মেয়েরা কেহ কেহ আমাকে এজন্য ঈর্ষা করিত। রাজবালা ও কালিদাসী আমাকে দেখিলেই মুচকি হাসিয়া বলিত, 'এবার তোর ভালই কপাল ফিরেছে।'

কর্তৃপক্ষদের মধ্যে একজন আমার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইলেন। আমিও ধরা দিলাম। তিনি আমার ঘরে মাঝে মাঝে রাত্রি যাপন করিতেন। জানিলাম, আমার মেয়েবন্ধুদের গৃহেও কর্তৃপক্ষদের অপর কেহ কেহ গোপনে যাতায়াত করিয়া থাকেন। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইল।[৫]

একদিন আমি আমার গুপ্ত প্রণয়ীর নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিলাম। কিন্তু তিনি সম্মত

হইলেন না। আমার সমবয়সি মেয়েরা মিলিয়া মাঝে মাঝে আমাদের গুপ্ত প্রণয়ের কথা তুলিয়া হাস্যপরিহাস করিত। রাজবালা ও কালিদাসীর সহিত প্রাণের কথা হইত। আমার পরামর্শে তারা দুজনেও বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিল। কিন্তু কোনো ফল হইল না। আমি বলিলাম, 'ভাই, যদি রূপ যৌবন বেচতে হয়, তবে লুকিয়ে চোরের মত কেন, একেবারে বাজারে নেমে দর যাচাই করে উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করব।' রাজবালা ও কালিদাসী সেইদিন হইতে তাহাদের প্রণয়ীদিগকে আর ঘরে প্রবেশ করিতে দিল না। আমিও তাহাই করিলাম। আমাদের উপর নানা উৎপীড়ন আর অত্যাচার আরম্ভ হইল। আমরা স্থির করিলাম, উদ্ধার আশ্রমে আর থাকিব না, কিন্তু আমরা নিরাশ্রয়, নিঃসহায়, কোথায় যাই।

তখন ইউরোপে মহাযুদ্ধ ভীষণভাবে চলিতেছে। ভারতবর্ষ হইতে বহু সংখ্যক শুশ্রূষাকারিণী নারী আহত সৈন্যদের সেবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়াছে। সেইজন্য কলিকাতা বোম্বাই—প্রভৃতি বড় বড় শহরের হাসপাতালগুলিতে নার্সের কাজ করিবার লোকের অভাব ঘটিয়াছে। আমাদের আশ্রমে সংবাদপত্র আসিত। আমি বাংলা খবরের কাগজ হইতে পড়িয়া অন্যান্য মেয়েদের শুনাইতাম।

রাজবালার মাথায় কী এক মতলব আসিল। সে একদিন আমাকে বলিল, 'আয় ভাই, আমরা নার্সের কাজ শিখি।' আমি বলিলাম, 'আশ্রমের কর্তৃপক্ষ সে ব্যবস্থা না করিলে তো হয় না।' শ্রীযুক্ত....দাস মহাশয় একদিন আশ্রম পরিদর্শন করিতে আসিলে রাজবালা তাঁহাকে এইসকল বিষয়ে কথা বলিল। তিনি শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং আমাদিগকে প্রাথমিক কিছু শিক্ষা দিবার নিমিত্ত একজন ডাক্তার নিযুক্ত করিলেন। কালিদাসী লেখাপড়া জানিত না। তাহাকে শিখাইয়া লইবার ভার আমার উপর পড়িল। তিন মাসের মধ্যেই সে খুব উন্নতি দেখাইল। মাঝে মাঝে আমাদিগকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইত। সেখানে আমরা নানাবিধ যন্ত্র ও ঔষধাদির নাম শিখিতাম।

গুপ্ত প্রণয়ীরা আমাদিগকে তখনও ছাড়ে নাই। তাহাদের অত্যাচারে একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলাম। একটা মেয়ের উপর একদিন পাশবিক অত্যাচারের উপক্রম করায় সে নিজেকে বাঁচাইবার জন্য পাশের বাড়িতে লাফাইয়া পড়ায় তাহার পা ভাঙিয়া যায়, এজন্য মোকদ্দমাও হইয়াছিল। কিন্তু তাহার ফলাফল শুনি নাই। একদিন সন্ধ্যার পরে আমি, রাজবালা, কালিদাসী ও আর একটি মেয়ে (তাহার নাম এখন মনে নাই—বোধ হয় খেঁদি বা এমন কিছু হইবে) এই চারিজন একখানি ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করিয়া টালিগঞ্জে আসিলাম। সেখান হইতে ট্রামে আমরা কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে [বর্তমানে বিধান সরণী] সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা মন্দিরে উপস্থিত হইলাম।

এই স্থানটি আমার পরিচিত ছিল। বাল্যকালে পিতার সহিত এই উপাসনামন্দিরে অনেকবার আসিয়াছি। আজ সেই কথা মনে পড়িয়া চক্ষে জল আসিল। উপাসনা শেষ হইয়াছে। সমবেত উপাসকগণ প্রায় সকলেই চলিয়া গিয়াছেন। কেবল কয়েকজন বিশিষ্ট

লোক অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমাদের ব্রাহ্ম মহিলার মত কাপড় পরা ছিল। পায়ে জুতাও ছিল, আমরা অগ্রসর হইয়া গেলাম।

ব্রাহ্মসমাজে আসিবার ষড়যন্ত্র আমরা অনেকদিন হইতেই করিতেছিলাম। রাজবালাই ইহার মূল কারণ। সে বলিয়াছিল ব্রাহ্মসমাজ সকলকেই গ্রহণ করে, ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করিলে বিবাহ করা সহজ হইবে। কিন্তু শেষে আমরা দেখিলাম, সেখানেও বাধা আছে।

সম্মুখে একজন পক্বকেশশ্মশ্রুবিশিষ্ট দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠদেহ বৃদ্ধকে দেখিয়া রাজবালা আমার কানে কানে বলিল, 'এই বুঝি কৃষ্ণকুমার মিত্র[২]—প্রণাম কর।' আমরা চারিজনেই পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলাম। তিনি স্নেহপূর্ণ স্বরে আমাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমরা তাঁহাকে একপাশে ডাকিয়া নিয়া সকল কথা বলিলাম এবং আমাদের রক্ষার উপায় করিতে অনুরোধ করিলাম। উদ্ধার আশ্রমের কর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহার ও আমাদের ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের অভিলাষ তাঁহাকে জানাইলাম।

তিনি বলিলেন, 'আপনাদের রক্ষার উপায় একাকী আমার দ্বারা সম্ভবপর হয় না। সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিগণকে জিজ্ঞাসা করাও প্রয়োজন।' তৎপরে তিনি একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোককে নিকটে ডাকিলেন। তাঁহার নিকট সমস্ত ঘটনা বলা হইলে তিনি বিশেষ ঘৃণার সহিত আপত্তি জানাইয়া কহিলেন, 'না, তা কিরূপে হয়? ইহাদের পূর্ব জীবন কলুষিত। ব্রাহ্মসমাজে কি পাপ প্রবেশ করিবে?' আমরা নিরাশ হইয়া চলিয়া আসিলাম। বিদায় লইবার সময় পুনঃপ্রণাম করিতে গেলে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় আমাদের প্রণাম গ্রহণ করিলেন ; কিন্তু অপর লোকটি, পরে শুনিয়াছিলাম তাঁহার নাম হেরম্ববাবু[১]— 'না—না—' বলিয়া সরিয়া গেলেন। এই ভদ্রলোকটির সহিত পরে আমার আর-একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহা বলিলে তিনি দুঃখিত হইতে পারেন মনে করিয়া বলিলাম না।

আমরা ভাবিতে লাগিলাম, এখন কোথায় যাই। উদ্ধার আশ্রমে আর আমাদিগকে নেবে না। সেখানে ফিরিয়া যাওয়াও আমাদের ইচ্ছা ছিল না। হঠাৎ আমার কমলার কথা মনে হইল। তাহার বাড়ির ঠিকানা আমি জানিতাম। অন্তত দুই-একদিন সেখানে থাকিতে পারিব, এইরূপ ভরসা হইল। একখানা ঘোড়া গাড়ি ভাড়া করিয়া আমরা চারিজনেই বাগবাজারে কমলার বাড়ির দিকে রওনা হইলাম।

কিন্তু সেখানে যাইয়া দেখি, কমলা তাহার মাতার সহিত কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তাহারা সে বাড়িতে নাই। অন্য লোক ভাড়াটে রহিয়াছে। তাহারা কমলাদের কোনো সন্ধান দিতে পারিল না ; আমি যেন একেবারে বজ্রাহত হইলাম। দীর্ঘকাল পরে নানা দুঃখ ভোগের পর বাল্যকালের প্রিয়বন্ধু কমলাকে দেখিব বলিয়া মনে বড়ই আনন্দ হইয়াছিল—কিন্তু সে আশা যে এরূপভাবে বিনষ্ট হইবে, তাহা কখনও মনে করি নাই। আমি মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলাম।

মুকুলদার ঠিকানা ভুলিয়া গিয়াছিলাম! কমলার সন্ধান তাঁহার কাছে পাওয়া সম্ভব ছিল।

আর কি উপায় আছে? রাজবালা বলিল, 'ভাই আজ রাত্রির মত আমি তোমাদিগকে একটা পরিচিত জায়গায় রাখিতে পারি। তারপর কাল সকালে যাহা হয় করা যাইবে।' আমরা অগত্যা সম্মত হইলাম। তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে।

সেই ঘোড়ার গাড়িতে আরও বেশি ভাড়া দিয়া আমরা চাঁপাতলায় হাড়কাটা গলিতে এক পতিতা নারীর গৃহে আশ্রয় লইলাম। এই স্ত্রীলোকটি রাজবালার পূর্বজীবনের পরিচিতা। সে সমস্ত বাড়িটা ভাড়া লইয়া তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন ঘরে বেশ্যা ভাড়াটে বসাইয়াছিল। তাহাতে তাহার কিছু লাভ হইত। এতদ্ভিন্ন পাপ ব্যবসায়ে উপার্জন ছিল। এই প্রকার স্ত্রীলোককে পতিতা নারী সমাজে 'বাড়িওয়ালি' [বা মাসি] নামে অভিহিত করা হয়। ইহাকে সকলে রানি-বাড়িওয়ালি বলিয়া ডাকিত।

বাজবালাকে অনেকদিন পরে পাইয়া, বিশেষত তাহার সঙ্গে আমাদের তিনজনকে দেখিয়া বাড়িওয়ালি অতিশয় আনন্দিত হইল। সে পরম যত্নের সহিত আমাদের সকলকে একটি ঘরে থাকিতে দিল, তাহাতে বিছানাপত্রেরও অভাব ছিল না। আমাদের কিছু খাবার ব্যবস্থাও হইল। রাজবালার সহিত বাড়িওয়ালি নানা কথাবার্তা বলিতে আরম্ভ করিল। দুশ্চিন্তায় আমাব মনে শান্তি নাই। জীবনে এই প্রথম আমি ব্যবসাদার খাঁটি বেশ্যার ঘরে প্রবেশ করি। আমার কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হইতেছিল। নীচের তলায় এক কোণে ঘর, আলো, বাতাস নাই। চারদিকে একটা নতুন রকমের দুর্গন্ধ। কোথাও মাতালের বমি, কোথাও গান-বাজনা, কোথাও হৈ হৈ চিৎকার, কোথাও গালাগালি-ঝগড়া—এই সব দেখিয়া-শুনিয়া আমার হৃদয় দমিয়া গেল। অথচ এখান হইতে পলাইয়া কোথায় যাইব তাহাও জানি না।

পরদিন সকালে খেঁদি বলিল, বেলিয়াঘাটায় তার এক মাসির বাড়ি আছে, সে সেখানে যাইবে। আমরা আপত্তি করিলাম না। সে চলিয়া গেল। আমরা আরও তিন-চারিদিন সেই বাড়িতে রহিলাম। ইতিমধ্যে বাড়িওয়ালি আমাকে ও কালিদাসীকে নানাপ্রকারে বুঝাইয়া বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিতে মত লওয়াইল। সেই চতুরা নারীর সঙ্গে আমি তর্কে পারিলাম না। সে যে সকল যুক্তি দেখাইল তার সারমর্ম এই—বেশ্যারা স্বাধীন ; ভগবান তাহাদিগকে রূপ দিয়াছেন, পুরুষকে ভুলাইবার কৌশল দিয়াছেন কিসের জন্য?—তাহা দ্বারা জীবিকা উপার্জন করিতে। উকিল তাহার বুদ্ধি বিক্রয় করে, পণ্ডিত তাহার বিদ্যা বিক্রয় করে, এমন কি দীক্ষাগুরুও মন্ত্র বিক্রয় করেন ; তবে রূপবতী কেন দেহ বিক্রয় করিবে না? বিপদ ভয় সকল ব্যবসায়েরই আছে। দেশের বড় বড় লোক সমস্ত বেশ্যাদের পায়ে বাঁধা। ধনী লোকদের টাকা বেশ্যাদের ঘরে উড়িয়া আসিয়া পড়ে। তাহাদের এক কটাক্ষের মূল্য সহস্র টাকা।

আমি ভুলিলাম। বাড়িওয়ালি আমার জন্য ঘর দেখিতে লাগিল, কালিদাসী সেই বাড়িতেই ঘর নিল। আমহার্স্ট স্ট্রীটের উপর যেখানে এখন সিটি কলেজের বাড়ি তৈয়ারি হইয়াছে,[৮] তাহার নিকটে এক বস্তিতে আমি ও রাজবালা দুইখানি খোলার ঘর ভাড়া

লইলাম। রানিবাড়িওয়ালি আমাদের দুইজনকেই কিছু টাকা ধার দিয়া জিনিসপত্র ও কাপড়চোপড় সমস্ত জোগাড় করিয়া দিল।

কুসঙ্গে কিরূপ অধঃপতন হয়, আর-এক দিক দিয়া তাহা দেখিতে পাইলাম। আমার স্কুলে পড়া বিদ্যা সমস্ত ভুলিয়া যাইবার গতিক হইল। মুকুলদার কাছে কত নূতন বিষয় শিখিয়াছিলাম—সাহিত্য, ইতিহাস, প্রভৃতি এখন সব চাপা পড়িয়া গেল।[৯] আমি যাহাদের সঙ্গে ছিলাম তাহারা কেহ লেখাপড়ার চর্চা করিত না। কেবল কার কয়টা লোক জুটিয়াছে—কার প্রণয়ীর সঙ্গে কী আলাপ হইল—আর যত সব অশ্লীল ব্যাপার, ইহাই ছিল প্রধান আলোচনার বিষয়। তারপর নিজেদের রান্না ও ঘরের কাজ সমস্ত করিতে হইত। আমরা লজ্জায় বাজারে যাইতাম না। অন্য কাহাকেও দিয়া বাজার করাইতাম।

লম্পট প্রণয়ীকে পতিতা সমাজে 'বাবু' বলা হয়।[১০] এখন হইতে আমি এই শব্দটি মাঝে মাঝে ব্যবহার করিব। এই 'বাবু' লইয়া খুব গোলযোগ হইত। কোনো পতিতার প্রণয়ী অন্য নারীর ঘরে প্রবেশ করিলে তাহা লইয়া তুমুল ঝগড়া বাধিয়া উঠিত। সকলেই তাহাতে যোগ দিত। আমিও বাদ যাইতাম না। আর যতরকমের অশ্লীল অশ্রাব্য কথা, শুনিতে শুনিতে আমার সহিয়া গিয়াছিল। বুঝিলাম স্কুলের পড়া হইতে যে অল্পবিদ্যা পাইয়াছি তাহা আমার অহংকার বাড়াইয়া সর্বনাশ করিয়াছে, কিন্তু আমাকে পাপের আক্রমণ হইতে বাঁচাইতে পারে নাই।

আমরা সন্ধ্যার পরে সাজিয়াগুজিয়া আরতি দেখিবার ছলে নিকটবর্তী ঠন্‌ঠনিয়া কালীবাড়িতে যাইতাম। সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া যখন দেখিতাম আমরা কোনো ভদ্রবেশধারীর নজরে পড়িয়াছি, তখন বাড়ির দিকে যাত্রা করিতাম। সেই ভদ্রবেশধারী ব্যক্তিও আমাদের সঙ্গ লইত। এই রূপে শিকার-কৌশল রানিবাড়িওয়ালি আমাদিগকে শিখাইয়াছিল।

আমি প্রথমে যাইতে আপত্তি করিতাম। আমার ভয় ছিল যদি বাপের বাড়ির কাহারও সঙ্গে দেখা হয়। যদি নন্দদাদা, সেই হরিমতি-ঝি, অথবা বাবার মোটর-ড্রাইভার, এমন কি বাবা নিজেই যদি দেখিয়া ফেলেন। রাজবালা আমাকে সাহস দিয়া বলিল, 'তোমাদের বাড়ি এ পাড়ায় নয়—সে ত এখান হইতে অনকে দূরে ; কলিকাতার মত শহরে কে কার খবর নেয়। এ পাড়ার লোক ও পাড়ায় যায় না।' আমিও বুঝিলাম তাহাই ; অবশেষে আমি সাবধানে রাজবালার সহিত বাহিরে যাইতাম। আমার আর-একটা আশা ছিল, যদি মুকুলদাকে কখনও রাস্তায় দেখি। কারণ আমার মনে পড়ে তাঁহার বাড়ি এ পাড়াতেই ছিল।

একদিন শীতের রাত্রিতে ঠন্‌ঠনিয়া কালীবাড়ি হইতে ফিরিবার সময় দেখিলাম একজন ভদ্রলোক মাথায় র‍্যাপার জড়াইয়া আমাদের পিছু পিছু আসিতেছেন। আমার বাড়ি পর্যন্ত আসিয়া তিনি রাজবালার ঘরে গেলেন। রাজবালা আমাকে ডাকিয়া বলিল, 'কাল রাত্রিতে যে লোকটি আমার ঘরে এসেছিল তিনি কে জানিস?—বৈঠকখানার বাজারের কাছে কি একটা কলেজ আছে[১১] সেই কলেজের তিনি বড় প্রফেসার, তাঁহার নাম শ্রী....। তিনি

আরও দুই-তিন দিন আমার ঘরে এসেছিলেন।' আমি তো নাম শুনিয়া অবাক। এঁর কথা মুকুলদার মুখে কতবার শুনিয়াছি। ইনি খুব ভাল পড়ান। আমি ভাবিলাম এই প্রফেসারের নিকট হইতে মুকুলদার কোনো খবর পাওয়া যায় কি না দেখিব।

রানিবাড়িওয়ালি আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে আসিত ; আমরা তাহাকে রানিমাসি বলিয়া ডাকিতাম। ক্রমে আমার ভয় দূরে গেল। আমি দেখিলাম অন্য সকল স্ত্রীলোক আমোদপ্রমোদে মত্ত থাকে, নিঃসংকোচে চলাফেরা করে—গঙ্গাস্নান, কালীঘাটে, যেখানে-সেখানে নির্ভয়ে যায়। তাহারা আমাকে বুঝাইল, এখন আর ভয় করিস কাকে? গভর্নমেণ্টের কাছে যখন একবার বলেছিস যে স্বেচ্ছায় এই বৃত্তি নিয়েছি, তখন আর কে তোকে কী বলবে? নাচতে নেমে লজ্জা করলে চলবে কেন?

রানিমাসি বলিল, 'তোমার পিতা যখন মনে করেন তুমি মরিয়াছ, তিনি যখন তোমায় আর ঘরে নিবেন না, তুমিও তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কচ্ছ না, তবে আর পিতাকেই বা ভয় কিসের?' আমি বলিলাম, 'তবু পিতা যদি দেখেন তাঁর কন্যা তাঁর সম্মুখে পাপ ব্যবসা করছে, তাঁর মনে দুঃখ হয় না?' রানিমাসি কহিল, 'তিনি কন্যাকে ঘরে নিয়া অনায়াসে সেই দুঃখ থেকে রক্ষা পেতে পারেন। মা, এ পথে যখন এসেছ, তখন অনেক নূতন চিত্র তোমার চোখে পড়বে। দেখবে সত্যই পিতার সম্মুখে কন্যা বেশ্যাবৃত্তি করছে—দেখবে সত্যই গর্ভধারিণী মাতা আপন কন্যাকে বেশ্যাবৃত্তি করবার জন্য নিত্য সাজিয়েগুজিয়ে দিচ্ছে—দেখবে সত্যই ভ্রাতা-ভগ্নী, আত্মীয়স্বজন বেশ্যা উপার্জিত অর্থে আত্মপোষণ করছে। পতিতা শুধু আমরা নই—প্রায় সমস্ত সমাজই অধঃপতিত হয়েছে।'

আমি ও রাজবালা কোনো উত্তর না দিয়া নীরবে শুনিতেছিলাম। রানিমাসি পুনরায় বলিতে লাগিল, 'মানি, কোন দিন হয়ত দেখবে তোমার নন্দদাদাই তোমার ঘরে উপস্থিত হয়েছে। তোমার মুকুলদাও আসতে পারে। মনে কিছু কোরো না মা, আমি স্বরূপ কথা বলছি। কোনো দিন হয়ত আমার ঘরেই তোমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ হওয়া অসম্ভব নহে।'

আমি লজ্জায় জিভ কাটিলাম। রাজবালা মাথা নিচু করিল, রানিমাসি বলিতে লাগিল, 'আর কি বলব মা, সেদিন যে একটি স্ত্রীলোক রামবাগান থেকে আমার বাড়িতে এসেছিল, তাকে তো তোমরা দেখেছ। তার ইতিহাস শুনবে? তার পিতা.....ভট্টাচার্য ; কলিকাতার কোনো কলেজের খুব বড় অধ্যাপকের কাজ করতেন। বেশি বয়সে কাজ ছেড়ে দিয়ে এখন রামবাগানে আপন রক্ষিতার গর্ভজাত কন্যার সহিত অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত হয়ে শেষকালটা কাটাচ্ছেন—এই তো অবস্থা। আমি অনেক দেখেছি, অনেক শুনেছি ; তোমরাও দেখবে।'

আমরা যে বাড়িতে ছিলাম, সেই বাড়িতে একটি স্ত্রীলোকের ঘরে একদিন দেখি সে একটা ছবিকে ফুলের মালা দিয়া সাজাইতেছে। স্ত্রীলোকটির বয়স কিছু বেশি, সৌন্দর্য তখনও রহিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ছবিখানি কার? সেই স্ত্রীলোকটি বলিল, উহা

শিবনাথ শাস্ত্রীর ছবি। তিনি ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রধান আচার্য ছিলেন। আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, 'ও হো—সেই শিবনাথ শাস্ত্রী, যাঁর 'নিমাইসন্ন্যাস' কবিতা আমরা স্কুলে কত মুখস্থ করেছি, না—

আজ শচীমতা কেন চমকিলে,
ঘুমাতে ঘুমাতে উঠিয়া বসিলে?
লুণ্ঠিত অঞ্চলে 'নিমু' 'নিমু' বলে
দ্বার খুলি মাতা কেন বাহিরিলে?

বাবার মুখেও এঁর নাম মাঝে মাঝে শুনতাম। তারপর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'শিবনাথ শাস্ত্রীর ছবি তুমি তোমার ঘরে রেখেছ কেন?' সে বলিল, 'আমি যখন ১৭/১৮ বৎসরের মেয়ে তখন এক প্রৌঢ়া পতিতা নারী আমাকে আশ্রয় দেয়। তাহার ছোট দুইটি ছেলে ছিল। তাহার প্রণয়ী বাবু তাহাকে একখানি বাড়ি দান করেন। রূপযৌবনবিক্রয়লব্ধ অর্থে আত্মপরিপোষণ করবার জন্যই সেই স্ত্রীলোকটি আমায় এনেছিল। সে চাঁপাতলার কোনো ছুতারের মেয়ে, ৭ বৎসর বয়সে বিধবা হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও শিবনাথ শাস্ত্রী তাহার পুনঃ বিবাহ দিতে চেয়েছিলেন। নানা কারণে তাহা হয় নি। শিবনাথ শাস্ত্রীকে সে বাল্যকালে দাদা বলে ডাকত। অবশেষে ঘটনাচক্রে সে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করল। আমি তাহার আশ্রয়ে আসবার পর একদিন শিবনাথ শাস্ত্রী সেই বাড়িতে আসেন এবং তাহাকে বেশ্যাবৃত্তি পরিত্যাগ করবার জন্য অনেক উপদেশ দেন। কিন্তু তাহাতে ফল হয় নাই। মৃত্যুর কিছুকাল পুর্বে সেই স্ত্রীলোকটির হৃদয়ে অনুতাপ জন্মে। তখন আমি বাড়িতে ছিলাম। আমি তাহাকে মা বলে ডাকতাম। সে শিবনাথ শাস্ত্রীর এই ছবিখানা তখন কিনে আনে। প্রতিদিন সে ইহাকে ফুল দিয়ে সাজিয়ে পূজা করত। মরবার সময়ে সে আমাকে ছবিখানা দিয়ে গেছে এবং যত দিন বাঁচি এমনি করে ফুল দিয়ে সাজাতে বলেছে। তার মৃত্যুর পর সেই দুই ছেলে বাড়ির দখল নিয়ে আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে। আমি এখন এইভাবে আছি।'[১২]

আমি বলিলাম, 'শিবনাথ শাস্ত্রী এত বড় উদার চরিত্র, পাপীকে উদ্ধার করবার জন্য বেশ্যালয়ে আসতে ঘৃণা বোধ করেন নি?' স্ত্রীলোকটি ছবিখানিকে প্রণাম করিয়া বলিল, 'তিনি অনেক পতিতাকে সৎপথে এনেছেন। ঢাকার এক পতিতা নারীর কন্যা লক্ষ্মীমণিকে তিনি উদ্ধার করে এক ব্রাহ্ম যুবকের সহিত বিবাহ দিয়েছিলেন, সে গল্প আমি শুনেছি।'[১৩] আমি বলিলাম, 'আর এখন ব্রাহ্মসমাজ কী হয়েছে। আমরা সেদিন স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে আশ্রয় নিতে গেলাম, তারা আমাদের নিলে না। হেরম্ববাবু নামে একজন, (পরে শুনেছি তিনি হেরম্বচন্দ্র মৈত্র) আমরা 'পাপী' বলে আমাদের প্রণাম পর্যন্ত গ্রহণ করলেন না। বোধ হয় আজ শিবনাথ শাস্ত্রী বেঁচে থাকলে আমাদের এ দশা হত না।'

এই অস্বাস্থ্যকর খোলার ঘরে থাকিবার ফলে আমার শরীর দিন দিন খারাপ হইতে লাগিল। রানিমাসির পরামর্শে গর্ভসঞ্চার নিরোধ করিবার জন্য একটা ঔষধ খাইয়াছিলাম—

তারপর হইতে আমার নানা রোগ দেখা দিল। রাজবালাও সেই ঔষধ খাইয়াছিল, কিন্তু তার কোনো অসুখ হইল না। আমি অতিশয় ক্ষীণ ও দুর্বল হইয়া পড়িলাম। সমস্ত শরীরে বেদনা। হাতপায়ের তলায় বিশ্রী দাগ, মুখে ফুস্কুড়ির মত হইয়া ক্ষত উৎপন্ন হইল। রানিমাসি দেখিয়া বলিল, হাসপাতালে না গেলে আর রক্ষা নাই।

আমি জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। বিছানায় পড়িয়া দিবারাত্রি অবিরত কাঁদিতাম। চক্ষের জলে বালিশ ভিজিয়া যাইত। সেইবার রোগে ভুগিয়া বুঝিয়াছিলাম, মরণে বোধ হয় সুখ আছে। আত্মীয়বন্ধু কেহ নাই। বাড়ির অন্য স্ত্রীলোক সকলে নিজ নিজ কার্যে ব্যস্ত। সন্ধ্যার পর সকলকেই ব্যবসায়ের খাতিরে দরজায় দাঁড়াইতে হয়? তারপর সারারাত্রি অনিদ্রায় মদ্যপানে অথবা নানাপ্রকার উত্তেজনায় কাটাইয়া তাহারা বেলা ৮টা ৯টায় ঘুম হইতে উঠে। আমাকে কে দেখিবে? চারিদিকে একটা বীভৎস ব্যাপার আমার চোখে পড়িল। আমরা যেন শূকরীর দল, কাদায় গড়াগড়ি দিতেছি। বুঝিলাম এবার আমার মৃত্যু নিশ্চয়।

রানিমাসি ও রাজবালা দুজনে মিলিয়া আমাকে হাসপাতালে দিয়া আসিল। তিন মাস পরে সুস্থ হইয়া আমি বাড়ি ফিরিলাম। তখন আমার হাতে একটি পয়সাও নাই।

সপ্তম

সমাজচিত্র

বৃন্দাবনে সেই মোহান্তজী আমায় বলিয়াছেন, 'অন্নবস্ত্রের দয়া তুমি অনেক পাবে।' তাঁহার কথাটি যে সত্য এই প্রমাণ আমি জীবনে বার বার পাইয়াছি। দারিদ্র্য হইতে রক্ষা পাওয়া কঠিন নহে, কিন্তু প্রবৃত্তির আক্রমণ হইতে কেহ বাঁচাইতে পারে না। অধিকন্তু সেই রাক্ষসীর গ্রাসে ঠেলিয়া দিবার লোক অনেক আছে। রানিমাসি এবার আমাকে তাহার নিজের বাড়িতে লইয়া গেল। সেখানে দোতলায় একখানা ভাল ঘর খালি হইয়াছিল। আমি তখন বুঝি নাই এই প্রকার দয়ার কার্যই আমাদিগকে সর্বনাশের পথে টানিয়া নেয়।

আমার যে বিদ্যা ছিল, তাহাতে আমি কাহারও বাড়িতে ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াইতে পারিতাম, টেলিফোন অফিসে কাজ করিতে পারিতাম—নার্সের কাজ করিতে, গান শিখাইতে পারিতাম, কিন্তু এই সকল সৎপথে অর্থ উপার্জন করিবার প্রবৃত্তি এবং সুযোগ কেহ আমাকে দেয় নাই। কেবল রূপযৌবনের পসরা লইয়া বাজারে ঘুরিবার দুর্মতি রানিমাসি আমার হৃদয়ে জাগাইয়া দিতে লাগিল।

আমি বলিলাম, 'রানিমাসি, আমার দেহকান্তি মলিন হয়েছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষীণ, বিশুষ্ক। মাথার চুলের আর সে পূর্বের শোভা নাই। আমার দ্বারা এই পথে আর কি উপার্জন হবে?' রানিমাসি আমাকে বুঝাইল, 'পতিতার রূপই প্রধান সম্পত্তি নহে। লম্পটেরা রূপ দেখিয়া মোহিত হয় না। দেখবে অতি কুরূপা বেশ্যা, সুন্দরীদের অপেক্ষা অধিক অর্থ উপার্জন

কচ্ছে। এই জন্যে বলে, 'যার সঙ্গে যার মজে মন।' পুরুষগুলি যখন সন্ধেবেলা বেশ্যাপল্লীতে ঘুরে বেড়ায়, তখন কন্দর্পঠাকুর তাদের চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেন।

রানিমাসি আমাকে কতকগুলো কৌশল শিখাইল। কাপড় পরিবার ফ্যাশান, দাঁড়াইবার ভঙ্গি, কথা বলিবার কায়দা, চলিবার রীতি, এসব কিরূপ হইলে লোক আকৃষ্ট হয় সে তাহা দেখাইয়া দিল। মনে দারুণ দুঃখ ও অপ্রীতির কারণ থাকিলেও আগন্তুক পুরুষের সঙ্গে হাসিয়া কথা কহিতে হইবে। এমন ভালবাসা দেখাইবে, তাহা যে কপট তাহা কেহ যেন ধরিতে না পারে। প্রণয়ী মদ্যপানাসক্ত হইলে মন রক্ষার জন্য কিরূপে মদের গ্লাস ঠোঁটের কাছে ধরিয়া মদ্যপানের ভাণ করিতে হয় তাহা দেখিয়া লইলাম। লম্পটদের মধ্যে যে ব্যক্তি যে প্রকারের আমোদ চায় তাহাকে তাহাই দিতে হয়। এইপ্রকার প্রতারণা শিক্ষা করিতে করিতে আমার বোধ হইল, যেন আমার হৃদয়ের মধ্যে একটা নূতন মানদার সৃষ্টি হইতেছে।

আমি ভাল গাহিতে পারিতাম। গলার সুরও আমার বেশ সুমিষ্ট ছিল, একথা পূর্বে বলিয়াছি। এ বিদ্যাটি পতিতার জীবনে খুব কাজে লাগে। রানিমাসি আমাকে গান শিখাইবার জন্য ওস্তাদ রাখিল। সে বলিল, 'তোমার ব্রহ্মসঙ্গীত স্বদেশি গান তো এখানে চলবে না। লপেটা, হিন্দি, গজল, অথবা উচ্চ-অঙ্গের খেয়াল-ঠুংরি, এসব হল বেশ্যামহলের রেওয়াজ।[১৪] কীর্তনও শিখিতে পার।' আমি তিন-চারি মাসের মধ্যেই সংগীতশিক্ষায় উন্নতি দেখাইলাম। কীর্তন শিখিতে কিছু দেরি হইল।

ছলনা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে লোক চিনিবার বিদ্যাও শিখিতে হইয়াছিল। কে চুরির মতলবে আসিয়াছে, কে কুৎসিত রোগাক্রান্ত, কে দুষ্ট প্রকৃতির লোক, কে ভালমানুষ ও সরলচিত্ত, এ সকল আমাদিগকে মুখ দেখিয়া ধরিতে হয়। অনেক সময় বিপদেও পড়িয়াছি। একদল লোক আছে তাহারা বেশ্যাবাড়িতে ডাকাতি করিয়া বেড়ায়। কখনও কখনও বেশ্যাকে হত্যাও করিয়া থাকে। এমনিভাবে প্রাণটি হাতে লইয়া পতিতা নারীকে ব্যবসা করিতে হয়। দু-পাঁচ টাকার জন্য কোনো নারী একেবারে অপরিচিত পুরুষকে গ্রহণ করে—হয়ত সেই বিশ্বাসঘাতক স্ত্রীলোকটির বুকে ছুরি বসাইয়া তাহার গহনাপত্র লইয়া পলায়ন করিল। হতভাগিনী আর চক্ষু মেলিল না। পতিতারা পাপের শাস্তি এইরূপেও হাতে হাতে পায়।

আমার ঘরে একটি ভদ্রলোক আসিতেন। তিনি কলিকাতার একজন ভাল চিকিৎসক। আজ পর্যন্ত তিনি নাকি বিবাহ করেন নাই। তাঁহার নিকট আমি অনেক উপকার পাইয়াছি। আমার শরীর যাহাতে শীঘ্র সারে, সেই জন্য তিনি খুব ভাল ভাল ঔষধ আমাকে দিয়াছিলেন। চিকিৎসাতেও তাঁহার অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। তাঁহার মত একজন চিকিৎসককে এত বেশি টাকা দর্শনী দিয়া আনানো আমার পক্ষে অসম্ভব। তিনি যেদিন দুইতিন ঘণ্টা আমার ঘরে বসিতেন, সেদিন আমাকে দশ-বিশ টাকা দিতেন। কখনও কখনও সন্ধ্যার পরে আমাকে মোটরে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইতেন—গ্র্যাণ্ড হোটেল, গঙ্গার ধারে, অথবা

ইডেন গার্ডেনে বেড়াইয়া আমরা অধিক রাত্রিতে বাড়ি ফিরিতাম, সেদিন আমি ৫০ টাকা পাইতাম। তাঁহার অনুগ্রহে আমার মাসে প্রায় দুই শত টাকা উপার্জন হইত।

রানিমাসি আমাকে সাবধান করিয়া বলিল, 'মা, রোজগার যা পারো এইবেলা করে নাও। শেষবয়সের কথা মনে রেখো। এখন থেকে কিছু না জমাতে পারলে ভবিষ্যৎ জীবনে কষ্ট পাবে। দেখছ ত এ পথে বন্ধুবান্ধব কেহই নাই। একমাত্র টাকাই সব।' আমি এই চিকিৎসক মহাশয়ের অনুগ্রহ পাইয়া অন্য দিকে রোজগারে একটু ঢিলা দিয়াছিলাম। রানিমাসি বুঝিয়াছিল, এই বাবু চিরদিন থাকিবেন না। তার অনুমান মিথ্যা হয় নাই।

সেই বৎসর আশ্বিন মাসে পূর্ববঙ্গে ভীষণ ঝড়-তুফান হয় [১৯১৫ সালে]। তাহাতে বহু লোকের প্রাণনাশ ঘটে। লোকের ঘরবাড়ি, বাগান, শস্যক্ষেত্র সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়। তাহাদের দুর্দশামোচনের জন্য কলিকাতায় এক সাহায্যভাণ্ডার খোলা হয়। বিখ্যাত ব্যারিস্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্তী[১৫] ও চিত্তরঞ্জন দাশ (উভয়ই এখন পরলোকে) এই সৎকার্যে অগ্রণী হন। তাঁহাদের চেষ্টায় বহু-সহস্র টাকা সংগৃহীত হইতে থাকে। যুবকেরা রাস্তায় রাস্তায় গান গাহিয়া ভিক্ষা করিত। বেশ্যাপল্লীতেও তাহারা আসিল। আমরাও সেই সাহায্যভাণ্ডারে যথাসাধ্য অর্থ দিয়াছি।

একদিন আমার সেই চিকিৎসক বাবু আমাকে বলিলেন, 'মানী, তোমরা পতিতা নারীরা মিলে যদি কিছু চাঁদা তুলে ওই ইষ্টবেঙ্গল সাইক্লোন ফাণ্ডে পাঠাও, মিঃ সি. আর. দাশ তাহলে বিশেষ সন্তুষ্ট হবেন। তাঁর ইচ্ছা, এই সৎকার্যের জন্য সমাজের সকল স্তরেই সাড়া পড়ুক। কি বল, পারবে?'

আমি বলিলাম, 'দেখুন, আমি তো এ পথে নূতন। সকলের সঙ্গে চেনাশুনা নাই। আপনি ভরসা দিলে আমার যতদূর সাধ্য করব।' তিনি বলিলেন, 'রামবাগান, সোনাগাছি, ফুলবাগানে আমার জানাশুনা আরও কয়েকজন মেয়েমানুষ আছে, থিয়েটারের অভিনেত্রীদেরও এর মধ্যে আনা যায়।'

চিকিৎসক মহাশয়ের সঙ্গে নাকি মিঃ সি. আর. দাশের পরিচয় ছিল, তাঁহার ও কতিপয় বন্ধুর চেষ্টায় কলিকাতার বেশ্যাপল্লী হইতে কয়েক সহস্র টাকা চাঁদা উঠিল। জনসাধারণের কার্যে এই আমার প্রথম যোগদান। এই সুযোগে আমি মিঃ সি. আর. দাশকে প্রথম স্পর্শ করিয়াছিলাম। আমরা যখন প্রণাম করিয়া তাঁহার পায়ে টাকার তোড়া রাখিলাম, তখন আনন্দাশ্রুতে তাঁহার বক্ষ প্লাবিত হইল। তিনি আমাদের মস্তক স্পর্শ করিয়া আশীর্বাদ করিলেন। বুঝিলাম তিনি সত্যই দেশবন্ধু।

রাজবালার সহিত একদিন দেখা করিতে গিয়া দেখি, তাহার ঘরে খুব ভাল দামি আসবাবপত্র আসিয়াছে। একখানা পালঙ্ক, দেওয়াল আয়না, বুক্‌কেস এই সব জিনিসে ঘর সাজানো রহিয়াছে। বিছানার জন্য গদি তৈয়ার হইয়াছে। তাহার গায়ে নতুন গহনাও দেখিলাম। রানিমাসির টাকা সে পরিশোধ করিয়াছে ; তাহার নিজের হাতে কিছু নগদ টাকাও জমিয়াছে। খোলার ঘরে থাকিয়া বেশ্যাদের এত অর্থ উপার্জন হয়, আমার পূর্বে

ধারণা ছিল না। আমি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রাজবালা কহিল, 'নানাপ্রকার লোক বেশ্যালয়ে আসে। যাহারা ধনী জমিদারের ছেলে তাহারা বন্ধুবান্ধব লইয়া প্রকাশ্যে বেশ্যাদের নিকটে যায়। লোকলজ্জাভয় ইহাদের নাই। ইহারা মদ্যপান, গান-বাজনা প্রভৃতি আমোদপ্রমোদে লিপ্ত হয়। ছোটখাট খোলার ঘরে ইহাদের পদার্পণ হয় না। রামাবাগান—সোনাগাছিই তাহাদের প্রধান তীর্থক্ষেত্র। আর-এক দল লম্পট আছে, যাহারা সমাজের নিন্দার ভয় করে, যাহারা উচ্চপদস্থ ব্যক্তি বলিয়া সম্মানিত, তাহারা একাকী গোপনে বেশ্যাগৃহে আসে। কেবলমাত্র তাড়নাই ইহাদের আসিবার কারণ। গান বাজনা বা অপর কোনো আমোদপ্রমোদ ইহারা চাহে না। লুকাইয়া লুকাইয়া ইহারা চলিয়া যায়, এদিকে লোকসমাজেও নিজেদের মানমর্যাদা ও সুনাম রক্ষা করে। কবি, সাহিত্যিক, সমাজসংস্কারক, নামজাদা উকিল, স্কুলের মাস্টার, কলেজের প্রফেসার, রাজনীতিক নেতা-উপনেতা, গভর্নমেণ্ট অফিসের বড় কর্মচারী, ব্রাহ্ম, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, বিদ্যাভূষণ, তর্কবাগীশ-প্রভৃতি উপাধিধারী অধ্যাপক, পুরোহিত, মোহান্ত, গুরুগিরি-ব্যবসায়ী এইসকল লোক এই শ্রেণির। আমার ঘরে একজন হাইকোর্টের বিখ্যাত উকিল আসেন। তিনি অতি উচ্চবংশীয় ভদ্রসন্তান।

তাঁহার নাম শ্রী...। বয়স একটু বেশি। তিনি আমাকে অনেক টাকা দেন। আমি সেই বাবুকে একদিন ঠাট্টা করে বলেছিলাম, 'তুমি হাইকোর্টের উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত হবে।' আমার সেই কথা ফলে গেছে। তিনি সত্যসত্যই হাইকোর্টে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি খুশি হয়ে আমায় এইসব জিনিসপত্র কিনে দিয়েছেন। আমার এই দামি আংটিটা তাঁহারই উপহার।'

রাজবালার সহিত কথা কহিতে কহিতে সন্ধ্যা অতীত হইল। আমি চলিয়া আসিব বলিয়া উঠিয়াছি এমন সময় একজন লোক রাজবালার ঘরে প্রবেশ করিল।' রাজবালা সেই লোকটিকে আদর-অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। আমি বাহিরে আসিয়া অস্ফুট স্বরে রাজবালাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ইনি কে? এঁকে ত ব্রাহ্মণপণ্ডিতের মত দেখাচ্ছে। রাজবালা বলিল, 'ইনি আমার এক বাবু। খুব বড় অধ্যাপক। ইনি মহামহোপাধ্যায় উপাধিধারী পণ্ডিত। ইনি আজকাল আমায় নিয়ে খুব মজেছেন। তবে শুনেছি এঁর একটা দোষ আছে—নিত্য নূতন চাই। বেশ্যামহলে ইনি সুপরিচিত। খোলার ঘরেই এঁর যাতায়াত বেশি। আমি যত দূর পারি কসে আদায় করে নিচ্ছি, কি জানি আবার কোন দিন সরে পড়বে।'

কিছুদিন পূর্বে কালিদাসী হাড়কাটা-গলির বাড়ি ছাড়িয়া রামবাগানে উঠিয়া গিয়াছে। সে একজন ধনবান ভাটিয়া সওদাগরের নজরে পড়িয়াছিল। একদিন কালিদাসীর নতুন বাড়িতে যাইয়া দেখি তার অতুল ঐশ্বর্য হইয়াছে। তেতলায় দুখানি বৃহৎ ঘর, একখানি বসবার একখানি শোবার। ইলেকট্রিক লাইট, পাখা, পালঙ্ক, বুক্‌কেস, বৃহৎ আয়না, ছবি, মার্বেল-পাথরের টেবিল, মেজেতে লিনোলিয়াম পাতা, শুভ্র ফরসা-বিছানা কোমল

তাকিয়ায় শোভিত, রুপার পানের থালা, অ্যাস্‌ট্রে। কৃষ্ণনগরের সুন্দর মাটির পুতুলে আলমারি সাজান। তিনসেট্ জড়োয়া গহনা—দুই সেট্ তোলা, এক সেট্ গায়ে। দামি বেনারসি শাড়ি ও ব্লাউজ তাহার বেড়াইবার পোশাক ; শান্তিপুর ফরাসডাঙ্গার দেশি শাড়ি তাহার আটপৌরে কাপড়। তাহার ভাটিয়া বাবু তাহাকে মাসিক ৩০০ টাকা নগদ দিত। এতদ্ব্যতীত ঘর ভাড়া ও খাওয়াপরার খরচ চালাইত।

কালিদাসীর এই সৌভাগ্য আলাদিনের প্রদীপের মত দুই-তিন মাসের মধ্যে হইয়াছে। আমি দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। কি উজ্জ্বল আশার আলোক আমি সম্মুখে দেখিতে পাইলাম। কোন শয়তান আমার অন্তরের মধ্যে বার বার জাগিয়া বলিতে লাগিল, 'এমন সৌভাগ্য তোমারও হতে পারে।' আমি সেই আলেয়ার পশ্চাতে ছুটিলাম।

পূর্বেই বলিয়াছি কালিদাসী রূপসী ছিল। এখন ভালভাবে থাকিবার ফলে তাহার সৌন্দর্য আরও ফুটিয়া বাহির হইল। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে হলেও কালিদাসী গান জানিত। আমিও তাকে কিছু শিখাইয়াছিলাম। এ বাড়িতে তাহার এক মা জুটিয়াছে। কালিদাসী বলিল এই স্ত্রীলোকটিই তাহাকে এই ভাটিয়া বাবু যোগাড় করিয়া দিয়া হাড়কাটা গলি হইতে রামবাগানে আনিয়াছে। কালিদাসী আমাকেও ঐ পাড়ায় যাইতে পরামর্শ দিল। আমি সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম।

রানিমাসির পাওনা আমি প্রায় শোধ করিয়াছিলাম, আমার আর কোনো ঋণ ছিল না। ঘরের জিনিসপত্র চলনসই রকম হইয়াছে। এই সময়ে আমার সঙ্গে একজন ভদ্রলোকের পরিচয় হয়। তিনি ব্রাহ্মণ যুবক, কোনো ব্যাঙ্কের বিশিষ্ট কর্মচারী ছিলেন। তাঁহার নাম শ্রী.... পাধ্যায়। দুই-তিন দিন আমার ঘরে আসিয়া তিনি আমার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। আমার গানই তাঁহাকে বিশেষরূপে মুগ্ধ করিল।

তিনি আমাকে স্থানান্তরে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। তিনি বলিলেন, 'আমি তোমাকে একটু উঁচু স্টাইলে রাখতে চাই। হাড়কাটা গলিটা অতি অভদ্রের জায়গা, এখানে যত ছোটলোকদের আমদানি।' আমি মনে মনে কহিলাম, 'হায় রে, বেশ্যার আবার ভদ্রাভদ্র বিচার। পতিতার উচ্চনীচ স্তরবিভাগ—এদেরও জাতিভেদ। এখনই অন্য স্থানে উঠিয়া গেলে আমার চিকিৎসক বাবুটিকে হারাইব এই ভাবিয়া আমি সম্মত হইলাম না। প্রকৃত কথা গোপন করিয়া বলিলাম, 'আমার দেনাপত্র আছে, বাড়িওয়ালিও কিছু টাকা পাবে, উঠতে হলে দু-চার মাস পরে উঠা যাবে।'

এই ব্যাঙ্কের কর্মচারী মাঝে মাঝে আমার গৃহে রাত্রিযাপন করিতেন। তাঁহার সঙ্গে দুই-একজন বন্ধুবান্ধবও আসিত। কেহ সামান্য পরিমাণে মদ খাইতেন। তবে নিতান্ত মাতাল কেহ ছিলেন না। আমি কখনও কখনও লুচি, পরোটা, মাছ, মাংস—প্রভৃতি সুখাদ্য প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগকে খাওয়াইতাম। এইরূপে ক্রমে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইল। আমার এই বাবুটির খুব পান খাওয়া অভ্যাস ছিল। সোনালি-রুপালি তবক দেওয়া দামি পান সর্বদা তিনি খাইতেন। তিনি বড় শৌখিন পুরুষ ছিলেন। ব্যাঙ্কের বিশিষ্ট কর্মচারী বলিয়া তিনি

একখানি সুন্দর বৃহৎ মোটরগাড়ি পাইয়াছিলেন। তাহাতে চড়িয়া তিনি আমার গৃহে আসিতেন। আমরা তাঁহার মোটরে অনেকবার বেড়াইয়াছি।

আমি কিছু দিন দুই দিক রক্ষা করিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু তাহা হইয়া উঠিল না। আমার চিকিৎসক বাবু বুঝিতে পারিলেন যে, আমি অন্য প্রণয়ীর হাতে পড়িয়াছি। তিনি ক্রমশ কম আসিতে লাগিলেন। শেষে আসা একদিন বন্ধ করিলেন। আমার...পাধ্যায় বাবু সর্বদাই আমাকে এ পাড়া ছাড়িয়া যাইতে বলিতেন। আমার দেনাপত্র শোধ করিবার নাম করিয়া তাঁহার নিকট হইতে পাঁচশত টাকা নগদ আদায় করিলাম। আর নূতন বাড়িতে যাইয়া বসিতে আরও অতিরিক্ত দুই শত টাকা লাগিবে, বলিলাম। তিনি সেই টাকাও দিলেন। আমি রামবাগানে কালিদাসীর বাড়ির নিকটেই একটি বাড়িতে দুখানি ভাল ঘর ভাড়া লইলাম।

আমার সেই চিকিৎসক বাবুটি এক্ষণে একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। পূর্বেই বলিয়াছি তিনি তখন পর্যন্ত বিবাহ করেন নাই। পতিতার ব্যবসায় প্রথম আরম্ভ করিয়া আমি অবিবাহিত যুবকদিগকেই একটু বেশি পছন্দ করিতাম। আমার বিশ্বাস ছিল, গৃহে তাহাদের পত্নী আকর্ষণ না থাকাতে তাহারা পতিতার প্রতি বেশি আসক্ত হইবে। কিন্তু এই দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় আমার সেই ভ্রান্তি দূর হইয়াছে। আমি দেখিয়াছি, যাহারা নিজের স্ত্রীকে ভালবাসে তাহারা নিজের রক্ষিতা নারীকেও ভালবাসে। অবিবাহিত যুবকেরা প্রায়ই চঞ্চলচিত্ত এবং তাহারা কাহারো উপর নিজের মনকে স্থিরভাবে বসাইতে পারে না।

আমার চিকিৎসক বাবুটি আমাকে ছাড়িয়া অনেক নারীর প্রতি আসক্ত হইয়াছেন, সে সংবাদও আমি শুনিয়াছি। এমন কি গৃহস্থের ঘরেও নাকি কেলেঙ্কারি ঘটাইয়াছেন। খবরের কাগজে সেই ইঙ্গিত দিয়াছে। সত্যমিথ্যা ভগবান জানেন।

রামবাগানে আসিয়া আমার সুখে-স্বচ্ছন্দে কাল কাটিতে লাগিল। কিন্তু আমার একটা দুঃখ মাঝে মাঝে প্রাণে জাগিয়া উঠিত। মুকুলদা অথবা কমলার কোনো সংবাদ পাইতাম না। পিতা, মাতুল বা নন্দদাদা—ইহাদের দেখা পাইতে আমার ভয় হইত, দেখা না হওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল। কিন্তু কমলা মুকুলদা এই দুইজন ত আমার পাপজীবনের গতির সূচনা জানে। সুতরাং তাহাদের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইত। পতিতার জীবন কিরূপ বিপদগ্রস্ত তাহা এই অল্পসময়েই আমি বুঝিয়াছি। আর সকলে আমায় ঘৃণা করে করুক, পায়ে ঠেলিয়া ফেলে ফেলুক—মুকুলদা ও কমলা কখনও আমায় পরিত্যাগ করিতে পারিবে না, এ বিশ্বাস আমার দৃঢ় ছিল।

রামবাগানে আসিয়া আমি পড়াশুনায় মন দিলাম, বাবুকে বলিয়া পুস্তক রাখিবার জন্য একটা আলমারি কিনিলাম। বাংলা-ইংরাজি সাহিত্যগ্রন্থাদি তাহাতে সাজাইলাম। বাবু আমার জ্ঞানপিপাসা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। মাসিক সংবাদপত্র 'প্রবাসী' ও 'ভারতবর্ষ' তিনি আমায় কিনিয়া দিতেন। দৈনিক খবরের কাগজ তিনি অফিস হইতেই লইয়া

আসিতেন। আমি তাহা পড়িতাম। গানে, পড়াশুনায়, বাবুর ভালবাসায় আমার মন একপ্রকার সাময়িক স্থিরতা লাভ করিল।

এই সময়ে সাহিত্যক্ষেত্রে একটা যুগান্তর আসিয়াছে—তাহার সহিত আমাদের পতিতাজীবনে নিকটসম্বন্ধ আছে বলিয়া এস্থলে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। কুলটার চরিত্র লইয়া বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার সমসাময়িক সাহিত্যিকগণ যে চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন, তাহাতে কুলটার প্রতি ঘৃণার ভাবই বদ্ধমূল হয়। 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'চন্দ্রশেখর' প্রভৃতি উপন্যাসে কুলটার পরিণাম, ভীষণ শাস্তি ও প্রায়শ্চিত্তই দেখিতে পাই।[১৬] এতাবৎকাল পতিতা নারীর জীবনের এমন দিক দেখানো হইয়াছিল, যাহা দেখিয়া লোক পতিতা নারীর সংস্পর্শে যাইতে ঘৃণা বোধ করে—লজ্জিত হয় ও ভয় পায়। অমৃতলাল বসুর 'তরুবালা' নাটকেও তাহাই দেখানো হইয়াছে। তারপর রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কয়েকখানি কুলটার [?] চরিত্রের অপর-এক দিক দেখাইয়াছেন, যাহাতে তাহার প্রতি সহানুভূতি জন্মে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যাহা অস্পষ্ট রাখিয়াছেন, শরৎ [চন্দ্র] চট্টোপাধ্যায় ও নরেশ [চন্দ্র] সেনগুপ্ত[১৭] এবং বহু তরুণ সাহিত্যিক তাহা খুলিয়া দিয়াছেন, যাহাতে লোক তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাঁহারা বলেন, 'বেশ্যারা অসতী হইতে পারে, কিন্তু তাহারা মনুষ্যত্বের আদর্শহীন নহে। পতিতা নারীও যখন সরলচিত্ত, ধর্মপ্রাণ, ঈশ্বরভক্ত, দয়ার্দ্রহৃদয়, দানশীল হইয়া থাকে, তখন ঘৃণার পাত্র হইবে কেন? দোষ সমাজের, পতিতার নহে।'

এই সকল উপন্যাস ও কথাসাহিত্য তরুণ যুবকযুবতীদের প্রাণে এক অপূর্ব চঞ্চলতা জাগাইয়া তুলিল। তাহারা 'শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী'[১৮] পড়িয়া রাজলক্ষ্মীর মত পতিতা নারীর খোঁজ করিতে লাগিল, 'শুভ'[১৯] পড়িয়া 'শুভ সঙ্গিনী'র মত অভিনেত্রীর সন্ধানে বাহির হইল। 'পর পারে'[২০] নাটকের সরযূকে তাহারা পাইতে পাগল হইল। আমার এই দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় বুঝিতে পারিয়াছি, বাংলার তরুণ যুবকের দল ক্রমশ অধিক সংখ্যায় কলুষ সংস্পর্শে আসিতেছে।

পতিতা নারীর জীবনের এই চিত্রকে নব্যসাহিত্যিকের দল রিয়্যালিস্টিক আর্টের অন্তর্গত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই আর্টের দোহাই দিয়া আজকাল সমাজের মধ্যে এক সর্বনাশী বিষ ছড়ানো হইতেছে। কলেজের উচ্চশিক্ষিত যুবকগণ নটের ব্যবসায় অবলম্বন করিতেছেন, সম্ভ্রান্তবংশীয় জমিদারপুত্র আপন স্ত্রী-কন্যা লইয়া প্রকাশ্যে রঙ্গমঞ্চে সহস্র সহস্র দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখে অভিনয় দেখাইতেছেন, পিতামাতা কন্যাদিগকে থিয়েটারের স্টেজে নাচিতে পাঠাইতেছেন, স্বামী স্বকর্ণে শুনিতেছেন তাঁহার স্ত্রী অভিনয়চ্ছলে অপরের সহিত প্রেম করিতেছেন, পিতা দেখিতেছেন কুমারী কন্যা রঙ্গমঞ্চে প্রেমের ছলাকলা শিখিতেছে। যিনি বিশ্বকবির উচ্চ আসন পাইয়াছেন, যাঁহার কাছে জগৎ আদর্শের প্রত্যাশা করে, তিনি থিয়েটারে যাইয়া নটীদের গানের মহলা দেখাইতেছেন।[২১] যে ব্রাহ্মসমাজের কাছে দেশ উচ্চ সুনীতির আদর্শ পাইতে চায়, তাহারাও আর্টের নেশায় মজিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়[২২], লেডী অবলা বসু[২৩], শ্রীযুক্তা কামিনী রায়[২৪], মিসেস বি. এল.

চৌধুরী, সরলা দেবী—ইঁহাদের মত লোকও ভদ্রঘরের যুবতীদের নৃত্যের সমর্থন করেন। ইহা লইয়া সাময়িক সংবাদপত্রাদিতে বহু বাদপ্রতিবাদ হইয়া গিয়াছে, আমি তাহা পাঠ করিয়াছি, আর জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিয়াছি।

আমার আত্মচরিত লিখিতে যাইয়া এত কথা বলিবার প্রয়োজন এই যে, আমাদের মত পতিতা নারীর জীবন যে অসংযম ও অসাবধানতার ফল, তাহা সমাজের প্রায় সকল স্তরে প্রবেশ করিতেছে। যাঁহারা সমাজের মঙ্গলচিন্তা করেন, তাঁহাদের দৃষ্টি এইদিকে আকৃষ্ট হউক, ইহা আমার অভিপ্রায় ও নিবেদন। যে অপরিণামদর্শী যুবকের কুহকে পড়িয়া আজ আমি পতিতা—এইপ্রকার রানি-চুনির প্রেমিকও এইসকল নাচগানের কর্ণধার রূপে আছেন, তাহা কি অভিভাবকগণ খবর রাখেন? নিজে মজিয়াছি বটে কিন্তু সমাজকে মজিতে দেখিলে দুঃখ হয়। আমাদের চুনির বাবু-শিল্পীটি...'সম্মিলনীর' একজন বিশেষ পৃষ্ঠপোষক। চুনির নিকটে এই সম্মিলনীর দুই-একটা অপবাদ শুনিয়াছি। সত্য-মিথ্যা ঠিক না জানায় উল্লেখ করিলাম না।

নব্যসাহিত্যের এই রিয়্যালিস্টিক আর্টের ফল আরও-এক দিকে দেখা দিল। পূর্বে পতিতা নারী সৎকার্যে অর্থদান করিতে চাহিলে অনেকস্থলে তাহা গৃহীত হইত না। এমন কি মফস্‌সলের ভূম্যধিকারী পতিতার নিকট হইতে ভূমির করও নাকি গ্রহণ করিতেন না। ক্রমশ এইভাব দূর হইতে লাগিল। এ বিষয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন অতি উদারহৃদয় ছিলেন। জনসাধারণের হিতকর কার্যে তিনি শুধু পতিতার দান গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, পতিতাদিগকে তিনি দেশহিতকর কার্যে আহ্বান করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য মহৎ, কিন্তু আমাদের মত নীচ দ্বারা তাঁহার উদ্দেশ্য সাধিত হইল না। ১৯১৮ সালের পর হইতে তাঁহার হস্তে ক্রমশ দেশের নেতৃত্বভার আসিতে থাকে। এদিকে নব্যসাহিত্যও পতিতাদিগের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল। সুতরাং আমরা প্রকাশ্যে ভদ্রসমাজে মিশিবার একটা সুযোগ পাইলাম। ইহার ফল কি হইল, তাহা যথাস্থানে বিবৃত করিব।

জনসাধারণের হিতসাধন সম্বন্ধীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনে প্রকাশ্যভাবে যোগদান করিবার বিষয় বলিবার পূর্বে আমার জীবনের আর দুই-একটা ঘটনা উল্লেখ করিয়া এ অধ্যায় শেষ করিতেছি।

আমাদের বাড়িতে একজন স্ত্রীলোক একখানি ঘর ভাড়া লইল। সে সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিল। কিছুদিনের মধ্যে আমি তাহার অন্তরের সমস্ত কথা অবগত হইলাম। এই স্ত্রীলোকটি দরিদ্র কায়স্থ ঘরের বিধবা। তাহার গুরু শ্রী...বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাহার সর্বনাশ করিয়াছেন। তিনি এখন আর কাছে ঘেঁসেন না। স্ত্রীলোকটি কলঙ্কের ভয়ে কোথাও আশ্রয় না পাইয়া বেশ্যাপল্লীতে আসিতে বাধ্য হইয়াছে। কারণ এই স্থান সকল কলঙ্ক ও পাপের ভাণ্ডার। আমি এই হতভাগিনীকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলাম।

আমার পরামর্শে স্ত্রীলোকটি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকটে চিঠি লিখিল। সৌভাগ্যক্রমে কিছুদিন পরে বিদ্যাভূষণ মহাশয় আসিলেন। আমি নানা ছলে তাঁহার সহিত পরিচয়

করিলাম। এ বিষয়ে আমার ব্যাঙ্কের বাবুটির নিকট প্রয়োজনমত উপদেশ লইয়াছি। একদিন আমি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট বিনয়ের সহিত অনুরোধ করিয়া বলিলাম, 'দেখুন, এ বেচারি এখন দুঃসময়ে পড়েছে, আপনি যদি পরিত্যাগ করেন এর উপায় কি হবে?' কিন্তু তিনি আমার কথা উপেক্ষা করিলেন। তখন আমি উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলাম, 'মহাশয়, আমরা পতিতা নারী—আপনাদের ঘৃণিতা, আর আপনি সমাজের কর্তা, আজ আমার কাছ থেকে আপনি তিরস্কার শুনে যেতে চান কি? ছিঃ, ছিঃ, আপনার লজ্জা হয় না? গুরুগিরি করতে গিয়ে সরলহৃদয় বিধবা শিষ্যাণীর সতীত্ব নষ্ট করেছেন, দরিদ্রকে কলঙ্কে ডুবিয়েছেন। আপনি না স্মৃতিশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, আপনি না অধ্যাপনা করে থাকেন? আপনার পাণ্ডিত্যে ধিক্—আপনার শাস্ত্রজ্ঞানে শত ধিক্। আমরা মহাপাপী বারবনিতা, আমরা নরকে যাব, ইহা সত্য—আপনারা নরকে যাবেন না কেন জানেন? আপনাদের জন্য এত বড় নরককুণ্ড এখনও তৈরি হয় নি।' আমার কথা শুনিয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয় চুপ করিয়া রহিলেন। আমি না থামিয়া, তাঁর মুখের কাছে তর্জনি হেলাইয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিলাম, 'আপনি যেতে চান চলে যান। কিন্তু জানবেন আমি একে দিয়ে আদালতে নালিশ করে আপনার কাছ থেকে খোরপোশ আদায় করে ছাড়ব। জানি, আপনি অস্বীকার করতে পারেন। কিন্তু আমরা এ বাড়ির সকলে সাক্ষ্য দিব যে আপনি এর ঘরে আসতেন এবং আপনার দ্বারা এর গর্ভসঞ্চার হয়েছে। আমরা তো কতই মিথ্যা বলি—যাতে একজন নির্দোষ নারীর উপকার হয়, যাতে এক শঠ লম্পটের শাস্তি হয়, সেইরূপ মিথ্যা বলতে আমাদের জিহ্বায় আটকাবে না।'

বিদ্যাভূষণ মহাশয় বিশেষ-কিছু না বলিয়া চলিয়া গেলেন, বুঝিলাম তিনি ভয় পাইয়াছেন। কয়েকদিন পরে তিনি আসিয়া আমার হাতে একশত টাকা দিয়া বলিলেন, 'এর জন্য যা কিছু খরচ প্রয়োজন হয়, এই টাকা থেকে করবে'। আমি তাহা গ্রহণ করিলাম এবং স্ত্রীলোকটির প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যোগাড় করিয়া দিলাম। যথাসময়ে ইহার প্রসব হইল। বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রসূতি ও সন্তানকে আমাদের বাড়ি হইতে সরাইয়া নিলেন। তারপর খবর লইয়া জানিয়াছিলাম, তিনি বিধবাটিকে বিশেষ অর্থসাহায্য করেন নাই। এই লোকটির দুশ্চরিত্রের কথা অনেকেই জানিত। আরও কয়েকটি শিষ্যাণীর সর্বনাশ তিনি করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার চাকুরিস্থলে বেনামি চিঠিতে সমস্ত রহস্য প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলাম। এমন সর্বনেশে লোকের শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। পরে শুনিয়াছিলাম, তাঁহার ভাল ভাল চাকুরি সব গিয়াছে। সংবাদ পাইলাম, তিনি নাকি বৃদ্ধ বয়সে [একটি] ষোড়শীবালার পানি গ্রহণ করিয়া তাঁহার অন্তরের যৌবনক্ষুধা মিটাইতেছেন। সমাজের যে অংশ ছাড়িয়া আসিয়াছি, তাহার এমন গলিত ক্ষত দেখিয়া পতিতাদেরও ঘৃণায় নাক সিঁটকাইতে হয়।

আমাদের বাড়ির নিকটে সুশীলা নাম্নী এক বারবনিতা বাস করিত। সে এক নবাবের রক্ষিতা। তার বিপুল সম্পত্তি, অতুল ঐশ্বর্য। উহা আর বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। নবাব বহু লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া তাঁহার রাজধানীতে বিরাট প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছেন, কিন্তু

তাহাতে তিনি থাকেন না। রাজধানী ছাড়িয়া কলিকাতায় এই রক্ষিতা বারনারীর নিকটেই অবস্থান করেন। এদিকে তাঁর সোনার পুরী শিয়াল-কুকুরের আবাসস্থল হইতেছে, প্রজাগণের দুর্দশার একশেষ, সুব্যবস্থা ও শাসনের অভাবে ঋণের পরিমাণ দিন দিন বাড়িতেছে। গরিব্ প্রজার রক্ত শোষণ করিয়া তাহা নটীর পূজায় ব্যয় করিতেছেন। নবাব-বাদশার মত লোক পতিতার প্রেমে মজিবে, ইহাতে নূতনত্ব নাই। তবে একথা এখানে উল্লেখ করিলাম কেন তাহার কারণ আছে ; সুশীলার ঘরে যাইয়া প্রায়ই দেখিতাম নবাবের রাজধানী হইতে বহুমূল্য আসবাবপত্র, ছবি, পর্দা, হিরা-জহরত, আয়না, গজদন্তের কারুকার্যখচিত দ্রব্য—এ সমস্ত আসিতেছে। ইহার কোনো-কোনোটি বিক্রয় করা হইত—কোনোটি বা সুশীলার ঘরেই শোভা পাইত। এই সকল দ্রব্য নবাবের পূর্ব পুরুষগণের কীর্তিচিহ্নস্বরূপ, রাজধানীর পুরাতন প্রাসাদে সজ্জিত ছিল। ঐতিহাসিক কীর্তিদর্শনার্থীরা তাহা দেখিয়া অতীত গৌরবের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিত। একটা তুচ্ছ বেশ্যার মনস্তুষ্টির জন্য এই কীর্তিচিহ্নসমূহ কি মূর্খের মত ধ্বংস করা হইতেছে, তাহা ভাবিয়া আমি দুঃখ করিতাম। যাহারা পূর্বপুরুষের প্রতি এমন শ্রদ্ধাহীন, তাহারা পরাধীন হইবে না ত হইবে কে?

সুশীলার বেড়াইবার জন্য মোটর গাড়ি ক্রয় করা হইয়াছে। সুশীলা নবাবের প্রধানা বেগমের চেয়ে অধিক ঐশ্বর্য, অধিক আদরযত্নে আছে। নবাব ঋণ করিয়া, মণিমুক্তাদি বন্ধক রাখিয়া সুশীলার এক হাজার টাকা মাসোহারা জোগাইতেছেন। ঋণের দায়ে নবাব-বাহাদুর মামলাতে জড়িত হইয়া কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে বাধ্য হইয়াছিলেন ; শৈলশৃঙ্গে বজ্রাঘাত পড়িল।

আমি পতিতা নারী হইলেও রাজনৈতিক সংবাদ লইয়া থাকি। আজকাল যাঁহারা স্বাধীনতার কথা তুলিয়াছেন, তাঁহারা ভাবিয়া দেখুন, এদেশের নবাব-বাদশার বংশধরেরা যদি স্বাধীনতার প্রিয় স্মৃতিচিহ্নসমূহ এমনি নির্মম হৃদয়ে পতিতার কলুষিত প্রেমানলশিখায় আহুতি দেয়, যদি পূর্বপুরুষের হাতের জিনিসের চেয়ে বেশ্যার বিলোল কটাক্ষের মূল্য বেশি হয়, তবে স্বাধীনতার আশা কোথায়? অপবিত্র আবর্জনার স্তূপে স্বাধীনতার বিশাল বোধিদ্রুমের জন্ম হয় না।

অষ্টম

অগ্নিক্রীড়া

১৯২০ সালে সমগ্র ভারতে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়। বাংলাদেশে উহার পরিচালনভার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন গ্রহণ করেন। ছাত্রগণ স্কুল-কলেজ ছাড়িবে, উকিল-ব্যারিস্টার আইনব্যবসায় পরিত্যাগ করিবেন, কেহ কাউন্সিলে যাইবে না—গভর্নমেণ্টের উপাধি বর্জন করা হইবে, বিদেশি দ্রব্য কেহ কিনিবে না ; এই পাঁচ

বকমের বয়কট সেই অসহযোগ-নীতির মূলমন্ত্র ছিল। ইহার প্রচারের জন্য সমস্ত দেশে, গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে সভা-সমিতি-বক্তৃতা-পিকেটিং, অর্থাৎ বিরোধকারীদিগকে বাধা দেওয়া চলিতে লাগিল, যুবকেরা স্বেচ্ছাসেবাদল গঠন করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। কর্মী চাই—কর্মী চাই—এই রব উঠিল।

ভদ্রমহিলাগণও পুরুষের সহিত কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহধর্মিণী পূজনীয়া শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী তাঁহাদেব নেত্রীর পদগ্রহণ করিলেন। তাঁহার সহধর্মী মহিলাদের মধ্যে উর্মিলা দেবী, সুনীতি দেবী, সন্তোষকুমারী দাশগুপ্তা, মোহিনী দেবী, হেমপ্রভা মজুমদার, বগলা সোম, উমা দেবী[১৫] ইহাঁদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পল্লীগ্রাম ও মফস্‌সল হইতেও বহু সংখ্যক মহিলাকর্মী আসিতে লাগিল। সে কি উৎসাহ, কি উদ্দীপনা, কি এক অপূর্ব কর্মচঞ্চলতা দেখিয়াছিলাম। এই সকল মহিলাকর্মীদিগকে সংঘবদ্ধ করিবার নিমিত্ত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন নারীকর্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন।[১৬] ইহার সম্বন্ধে পরে বলিব।

পুলিশ চারিদিকে খুব ধরপাকড় আরম্ভ করিল। মহিলাকর্মীরাও পুলিশের হাতে নিস্তার পান নাই। আমরা কয়েকজন পতিতা নারী মিলিয়া একটা ছোট দল গঠন করিলাম। আমাদের বাবুগণ পশ্চাতে থাকিয়া আমাদিগকে পরামর্শ ও উৎসাহ দিতেন। ইতিপূর্বে ইস্টবেঙ্গল সাইক্লোন ফাণ্ডের জন্য চাঁদা তুলিতে যাইয়া আমরা বাহিরের ভদ্র লোকদের সঙ্গে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছি। তাহাতে আমাদের সাহস, চতুরতা ও দক্ষতা বাড়িয়াছিল। অনেক ছোট-বড় দেশনেতার সহিত পরিচয় হইয়াছিল। এবার যখন আমরা পুনরায় কার্যক্ষেত্রে নামিলাম, তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহকর্মীরা অতিশয় সুখী হইলেন এবং আমাদিগকে বিবিধপ্রকারে সাহায্য করিলেন।

এই অসহযোগ আন্দোলনের উত্তেজনা এত তীব্র ও প্রবল হইয়া উঠিল যে, একসঙ্গে সকলে কাজ করিবার সময় মনে থাকিত না যে আমরা অস্পৃশ্য ঘৃণিত বেশ্যা, আর ইহারা সম্মানিত ভদ্রগৃহস্থ যুবক। সেই কর্মী যুবকেরাও ভুলিয়া যাইত যে তাহারা বারবনিতার সহিত চলাফেরা করিতেছে। যে সকল পবিত্রচরিত্র ব্যক্তি কখনও বেশ্যালয়ে আসেন নাই বা আসিবার কল্পনাও করেন নাই, তাঁহাদের সঙ্গে আমরা এই অসহযোগ আন্দোলনের নেশায় মাতিয়া এক-মোটরগাড়িতে বেড়াইয়াছি, হাস্য পরিহাসের সহিত তাঁহাদের সঙ্গে কথাও বলিয়াছি। সকলে আমাদের স্বার্থত্যাগের প্রশংসা করিতেন, গর্বের আনন্দে আমাদের বুক ফুলিয়া উঠিত।

একদিন কর্মশেষে গৃহে ফিরিবার পূর্বে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নিকট বিদায় লইবার সময় তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি স্নেহভরে আমাদের আশীর্বাদ করিলেন। একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি সেই স্থানে বসিয়াছিলেন। আর কেহ ছিলেন না। আমরা যে বারবনিতার দল, তাহা তিনি বুঝিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে তিনি প্রশ্ন করিলেন, 'শেষকালে এরাও এসে কাজে নেমেছে—এটা কি ভাল হচ্ছে মিঃ দাশ?' চিত্তরঞ্জন শ্লেষের সহিত উত্তর করিলেন, 'আপনারা হলেন রুচিবাগীশের দল। আমার সঙ্গে আপনাদের মিলবে না। সঞ্জীবনী-সম্পাদক

কেষ্ট মিত্তিরের কাছে যান। তিনি আপনাদের মনের মত লোক। কেশব সেনের সংকীর্ণতা[২৭] থেকে মুক্ত হয়ে উদার মত অবলম্বন করার জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টি হল ; কিন্তু শেষে উহারই মধ্যে ক্ষুদ্রতা দেখা দিল। কূপের মত এতটুকু হলে হবে না—সমুদ্রের মত প্রশস্ত বিশাল হয়ে সকলকে গ্রহণ করা চাই। পাশ্চাত্য দেশে কি দেখছেন? আমাদেরও তাই করতে হবে। যাদের ঘৃণায় দূরে ঠেলে রেখেছি, তারাই আজ এগিয়ে আসছে। এ শুভলক্ষণ, আমি আস্তাকুড়ের আবর্জনায় এক অপূর্ব শক্তির সন্ধান পেয়েছি।'

আমরা চলিয়া আসিলাম। তাঁহার [তাঁহাদের] তর্কবিতর্ক কতদূর চলিয়াছিল জানি না। কিন্তু আজ দেখিতেছি, আমরা দেশবন্ধুর আশা পূর্ণ করিতে পারি নাই। আমরা সেই মহাপুরুষের সুখের স্বপ্ন ভাঙিয়া দিয়াছি। তিনি মনে করিয়াছিলেন, দেশসেবার অনলে আমাদের সকল পাপ দগ্ধ হইয়া যাইবে। তাহা হইল না। দেশকর্মীদের সহিত বারবনিতাদের এইপ্রকার অবাধ মেলামেশার ফল ভাল হইল না।

আগুন লইয়া খেলা বড় বিপজ্জনক। সকলে তাহা পারে না। আমাদিগকে কর্মক্ষেত্রে আনিয়া দেশনায়কগণ ভুল করিয়াছিলেন। সৎকার্যের অনুষ্ঠানে একটা পবিত্রতার ভিত্তির প্রয়োজন। আমাদের তাহা ছিল না। আমরা শুদ্ধচিত্ত ও সংযত না হইয়াই একটি গুরুতর কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। মিথ্যাচার, প্রতারণা, ছলনা, ইন্দ্রিয়পরতা এই সব হইল বারবনিতাদের চরিত্রের প্রধান লক্ষণ। দেশের কার্যে ব্রতী হইলেও আমাদের এই সকল দুষ্প্রবৃত্তিই আমাদিগকে পরিচালিত করিল। সুতরাং কথায় যে বলে 'শিব গড়িতে বানর'—আমাদেরও হইল তাহাই।

যে সকল কর্মী যুবকের চরিত্রবল এমন ছিল যে একটা সিগারেট পর্যন্ত কখনও খায় নাই, তাহারা কেহ কেহ এই অসহযোগ আন্দোলনের কর্মক্ষেত্রে আমাদের সঙ্গে মিশিয়া মদ্যপান পর্যন্ত শিখিয়াছে। যে সকল যুবকগণ এমন পবিত্রচিত্ত ছিল যে স্ত্রীলোকের সহিত কথা কহিবার সময় মাথা তুলিত না—তাহারা আমাদের সংসর্গে আসিয়া এখন বেশ্যা দূরে থাক, কুলবধূর সহিত নির্লজ্জের মত কুৎসিত হাস্যপরিহাস করিতে অনেকে লজ্জিত হয় না। পতিতা নারীদের একটা প্রধান স্বভাব এই যে তাহারা সচ্চরিত্র ও সংযত চিত্ত পুরুষ দেখিলে তাহাকে হস্তগত করিতে বিশেষ চেষ্টা করে এবং তাহার সংযম ও পবিত্রতাকে বিনষ্ট করা একটা বীরত্বের কার্য বলিয়া মনে করে।

আমি জানি, আমরা যে কয়জন এই অসহযোগ আন্দোলনের কার্য করিতে গিয়াছিলাম, তাহারা প্রত্যেকে অনেক দেশকর্মী যুবকদিগকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল। আমিও সেই অপরাধ হইতে মুক্ত নহি। এমন কি কেহ কেহ পিতৃতুল্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পারিষদদিগের প্রতিও কটাক্ষ হানিতে ছাড়ে নাই। বাড়িতে ফিরিয়া আমরা এই আলোচনাই করিতাম, কে কয়টা নূতন 'বাবু' জুটাইয়াছে, কার ঘরে কোন্ দেশকর্মী আসিলেন, পরের টাকায় কেমন পান-সিগারেট খাওয়া হইল, মোটর চড়া গেল, ট্যাক্সিভাড়ার টাকা হইতে কে কত টাকা আঁচলে বাঁধিয়াছে, ইত্যাদি।

আমরা যে শুধু যুবকদের অধঃপাতে লইয়া গিয়াছি, তাহা নহে। গৃহস্থ ঘরের কন্যা ও বধূরাও আন্দোলনে যোগ দিয়া বাহিরে আসিয়াছিলেন। অবশ্য উহারা উদার, শিক্ষিত পরিবারেরই বৌ-ঝি। সাধারণত গোঁড়া হিন্দুরা তাঁহাদের অন্তঃপুরের স্ত্রীলোকদিগকে এ-ভাবে বাহিরে যাইতে দেন না। গৃহস্থঘরের যে সকল মহিলা আমাদের সহিত কার্য করিতেন তাঁহাদের কাহারও সহিত নানা কথা প্রসঙ্গে আমাদের আলাপ হইত। আমি জানি, কয়েকটি ভদ্র গৃহস্থের বধূ অসহযোগ আন্দোলন প্রচারের কার্য করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা আর তাঁহাদের স্বামীর নিকট ফিরিয়া যান নাই। কেহ কোনো কার্য আরম্ভ করিয়াছেন, কেহ বা কোনো দেশকর্মীর সহিত অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত হইয়াছেন, কেহ কেহ স্বামী-স্ত্রী ভাবে বাস করিতেছেন। এই সকল দেশকর্মীর আচরণ সকল লোকই জানে, অথচ তাহারা ভোট দিয়া এইপ্রকার সাধুবেশী লম্পটস্বভাব ব্যক্তিদিগকেই করপোরেশন কাউন্সিলে প্রেরণ করে। সমাজের অন্ধতা এতদূর গভীর।

এই সম্পর্কে একটি কথা বলিতেছি। মফস্‌সলের এক ব্রাহ্মণ গৃহস্থ যুবকের স্ত্রী অসহযোগ আন্দোলনে মহিলা কর্মীদের সহিত কার্য করিতে আসিয়াছিলেন, এই বধূটি পরমাসুন্দরী—আমি তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তাঁহার সহিত আমার একদিন কথাবার্তাও হইয়াছে। এই পুস্তকখানি যদি কখনও তাঁহার হাতে পড়ে, তবে তিনি হয়ত আমাকে চিনিতে পারিবেন। তাঁহার সহিত আমার অল্প পরিচয়েই একটু বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। তাঁহার সম্পর্কিত ঘটনা এখানে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছি বলিয়া আমি তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি। তিনি যে অধঃপাতে গিয়াছেন, তার জন্য অংশত কে দায়ী, তাহা আমি জানি।

আমার মনে আছে, আমি ব্রাহ্মণ কুলবধূটির সহিত একটু অন্তরঙ্গভাবে নানা ভাবের আলাপ করিয়াছিলাম। তিনি এক দেশকর্মী কায়স্থ যুবকের সহিত অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত হইয়াছেন। এই যুবকটি উচ্চশিক্ষিত, আকুমার ব্রহ্মচারী ছিলেন। আমি প্রথমে একটু আশ্চর্য হইলাম। কারণ, আমার এমন সুন্দরী যুবতী বন্ধুটি যে শেষকালে একটা বাঙাল যুবকের প্রেমে মজিবে তাহা ভাবি নাই। একবার এই ব্রাহ্মণ বধূটি অপর কতিপয় মহিলাকর্মীর সহিত প্রচারকার্য করিবার নিমিত্ত পূর্ববঙ্গে গিয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মণ-বধূটি নারী-কর্ম-মন্দিরের এক নির্জন কক্ষে ঐ চিরকুমার কর্মীর নিকট গীতা পড়িতেন।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, মফস্‌সল হইতে যে সকল মহিলাকর্মী আসিয়াছিলেন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কলিকাতায় তাঁহাদের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহা হইতেই নারী-কর্ম-মন্দিরের সৃষ্টি হয়। প্রথমে উহা ভবানীপুরে দেশবন্ধুর সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে ছিল। তাঁহার অন্যতম সহকারী শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মজুমদার মহাশয়ের[১৮] পত্নী শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার[১৯] যখন কর্মক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতা দেখাইলেন, তখন তাঁহার উপরেই নারী-কর্ম-মন্দিরের ভার অর্পিত হয় এবং উহা কলিকাতার সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটে স্থানান্তরিত হয়।

সেই ব্রাহ্মণ বধূটি স্বামী ছাড়িয়া আসিবার পর আর গৃহে যান নাই, কলিকাতাতেই থাকেন। নব প্রণয়ীর সহিত অবৈধ সংসর্গের ফলে তাঁহার গর্ভসঞ্চারের লক্ষণ দেখা যায়।

তখন দেশকর্মী যুবকটি সেই বধূটিকে লইয়া পলায়ন করিলেন। যাঁহারা এই অবৈধ প্রণয়ে বাধা দিয়াছিলেন, তাঁহারা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে এ বিষয়ে জানান। কারণ যুবকটি তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। কিন্তু তিনি ইহার কোনো প্রতিকার করিতে পারেন নাই।

কর্মীদের মধ্যে নারী-পুরুষের এই প্রকার কলুষিত সম্মিলনের অনেক ঘটনা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন জানিতেন। কিন্তু তিনি যখন দেখিলেন, আর কিছুতেই তাহা প্রতিরোধ করিতে পারিতেছেন না, নীতিহীনতার জন্য চরিত্রবান কয়েকটি বিশিষ্ট কর্মী চলিয়া গেলেন, তখন দুশ্চিন্তায় তাঁহার হৃদয় দমিয়া গেল—দেহ ভাঙিয়া পড়িল—স্বাস্থ্য নষ্ট হইল। অর্থলোভী কর্মীগণ তাঁহার নিকট হইতে অতিরিক্ত অর্থশোষণ করিতে লাগিল, তদুপরি এই দারুণ আঘাত পাইয়া তিনি আর মাথা তুলিতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর শবদেহ লইয়া যে বিরাট শোকযাত্রা হইয়াছিল তাহাতে যোগ দিবার জন্য আমাদের পল্লী হইতে পতিতাগণ গিয়াছিল। আমি যাই নাই। কোনো বন্ধুর নিকট বলিয়াছিলাম, 'দেখুন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে আমরাই মেরেছি। তাঁর অকালমৃত্যুর জন্য আমরাও দায়ী। দেশসেবার ছল করে আমরা তাঁহার কর্মীর দলের স্তরে স্তরে পাপের বিষ ছড়িয়ে দিয়েছি। জীবিত অবস্থায় এইভাবে তাঁকে আমরা আঘাত করেছি। আজ মৃত্যুর স্পর্শে যখন তিনি বিশুদ্ধ হয়ে স্বর্গে চলেছেন, তখন আর আমার মত পতিতার পাপদৃষ্টি যেন তাঁহার পবিত্র মুখের উপরে না পড়ে।' এই ভাবিয়াই আমি দেশবন্ধুকে শেষ দেখা দেখি নাই।

এখন সেই ব্রাহ্মণ বধূটি তাহার প্রণয়ীর সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী ভাবে বাস করিতেছেন। তাঁহাদের নাকি সন্তান জন্মিয়াছে। সমাজে তাঁহারা এক প্রকার নিঃসঙ্কোচে চলিতেছেন। ব্রহ্মচর্যব্রতাবলম্বী উচ্চশিক্ষিত (?) দেশকর্মী যুবক এইরূপে পরদার গ্রহণ করিয়া সমাজে মর্যাদা লাভ করিয়াছেন, এখন রাজদরবারেও তাঁহার উচ্চ আসন। হায় সমাজ, পুরুষের বেলায় তুমি অন্ধ!

পিকেটিং করিবার সময় পুলিশ মহিলাকর্মীদের গ্রেপ্তার করিত। একবার শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী ও শ্রীযুক্তা বগলা সোম-প্রভৃতিকে থানায় নিয়া সাবধান করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। আমরা পুলিশকে ভয় করিতাম না। কারণ ঘাঁটির পাহারাওয়ালা হইতে পুলিশের উচ্চ কর্মচারী পর্যন্ত সকলের সহিত আমাদের বিশেষ পরিচয় থাকে। আমাদের কয়েকজনকেও পুলিশ ধরিয়া থানায় নিয়াছিল। সেখানে প্রধান কর্মচারী আমাকে দেখিয়াই একটু মুচকি হাসিলেন। দেখিলাম তিনি আমার পরিচিত। বিখ্যাত অভিনেত্রী নীরদাসুন্দরীর[৩০] গৃহে তাঁহার সহিত আমার আলাপ হয়। কলিকাতার মধ্যে সকলেই এই ব্রাহ্মণবংশীয় পুলিশ কর্মচারীকে ভালরূপ জানেন। বলা বাহুল্য, তিনি আমাদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে উত্তরবঙ্গে জলপ্লাবন হয়। বন্যাবিধ্বস্ত লোকদের সাহায্যের জন্য কলিকাতায় নানাপ্রকার চাঁদা তোলা হইতে থাকে। ইহার জন্য এক কেন্দ্রীয় সমিতি গঠিত হয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান অধিনায়ক হইয়াছিলেন। ছাত্র ও যুবকেরা রাস্তায় রাস্তায় গান গাহিয়া ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, ধনী লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত

হইয়া বহু অর্থ দান করিলেন, থিয়েটার-বায়স্কোপ কোম্পানিব মালিকেরা বেনিফিট নাইট-এর বন্দোবস্ত কবিলেন ; ছোট ছোট ক্লাব ও নানাপ্রকার সমিতি আমোদপ্রমোদের দ্বারা অর্থসংগ্রহ করিলেন, গভর্নমেণ্টের পক্ষ হইতেও সাহায্যের জন্য সামান্য টাকা মঞ্জুর হইল।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় প্রকাশ্য কর্মক্ষেত্রে নামিয়া আমাদের সাহস বাড়িয়াছিল। সুতরাং এই ব্যাপারেও আমরা উদাসীন রহিলাম না। আমাদের দল পূর্ব হইতেই একপ্রকার গঠিত ছিল। তবে এবার উহাকে আরও বড় করিতে হইল। আমরা প্রস্তাব করিলাম, নিজেদের মধ্যে চাঁদা না তুলিয়া দল বাঁধিয়া গান গাহিয়া রাস্তায় ভিক্ষা করিতে হইবে। তদনুসারে হাড়কাটা গলি, রামবাগান, সোনাগাছি, ফুলবাগান, চাঁপাতলা, আহিরীটোলা, জোড়াসাঁকো, সিমলা, কেরানিবাগান—প্রভৃতি বিভিন্ন পল্লীর পতিতাগণ পৃথক পৃথক দল গঠন করিয়া রাস্তায় ভিক্ষা করিতে বাহির হইল।

সে এক অপূর্ব দৃশ্য। কলিকাতার অধিবাসীগণ স্তম্ভিত হইয়া গেল। এক-এক দলে প্রায় ৫০/৬০ জন পতিতা নারী—তাহাদের পরিধানে গেরুয়া রঙের লালপাড় শাড়ি—এ'লো চুল পিঠের উপর ছড়ানো, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, কণ্ঠে মধুর সংগীত, মনোহর চলনভঙ্গি, সঙ্গে কয়েকজন পুরুষ ক্লেরিয়নেট্ ও হারমোনিয়াম বাজাইতেছে। অগ্রে অগ্রে দুইটি নারী একখানি শালুর নিশান ধরিয়া যায়, তাহাতে কোন্ পাড়ার পতিতা নারী সমিতি, তাহা লিখিত আছে। তাহার পশ্চাতে অপর দুই নারী একখানি কাপড় ধরিয়াছে, তাহাতে দাতাগণ টাকা-পয়সা-নোট-প্রভৃতি ফেলিয়া দিতেছে। আর দুইজন স্ত্রীলোক পুরাতন বস্ত্র সংগ্রহ করিতেছে।

বেশ্যাদের মধ্যে অনেকেই যে খুব সুন্দরী তাহা নহে, তবে তাহারা সকলেই নিতান্ত কুৎসিত, একথাও সত্য নয়। যাহা হউক, সাজিয়া বাহির হইলে পতিতা নারীদের সকলকেই সুন্দরী দেখায়। কারণ, ইহার উপরেই তাহাদের ব্যবসার ভিত্তি। রূপ দেখাইয়া জনসাধারণকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য কলিকাতার রাজপথে বেশ্যাদের দাঁড়াইবার নিয়ম নাই। তাহা হইলে তাহাদিগকে পুলিশে বাঁধিয়া নেয়। প্রলুব্ধ করিবার জন্য তাহারা তাহাদের দরজার চৌকাঠের বাহিরে আসিতে পারে না।[৩১] সুতরাং, খাঁটি বেশ্যাপল্লীতেও তিন-চারটি স্ত্রীলোককে কদাচ রাস্তার উপরে এক সঙ্গে দেখা যায়। এমন অবস্থায় যদি বেশ্যারা দল বাঁধিয়া গান গাহিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া চলিতে থাকে, তবে তাহা সাধারণ লোকের চক্ষে কেমন লাগে তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, নিত্য অসংযম ও ভোগলালসার মধ্যে থাকাতে পতিতা নারীদের চরিত্রে কুভাবই প্রবল থাকে। অসহযোগ আন্দোলনে দেশপ্রীতির ভাব, অথবা বন্যাপীড়িতের সাহায্যে ভিক্ষা করার কার্যে দয়ার ভাব পতিতা নারীদের চিত্তকে বিশেষ অধিকার করে নাই। আমরা নিজেদের লোকের সম্মুখে জাহির করিবার একটা সুযোগ পাইয়া তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছি, এই মাত্র। সকলে না হউক, অন্তত অনেকে।

আমরা যখন ভিক্ষা করিতে বাহির হইতাম তখন শত শত লোক আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিত।

বন্যাপীড়িত-দুর্দশাগ্রস্ত নরনারীদের দুঃখে কাতর হইয়া সকলেই আমাদের তহবিলে টাকা দিত না ; আমাদের রূপ দেখিয়া, আমাদের গান শুনিয়া, আমাদের কটাক্ষ খাইয়া, তাহারা মুগ্ধ হইয়া টাকা দিয়া যাইত। ছাত্র ও যুবকের দলে এত লোকের ভিড় হইত না।

সকালে ও সন্ধ্যায় দুই বেলাই পতিতা নারীর দল অর্থ সংগ্রহ করিতে বাহির হইত। আমরা বহু সহস্র টাকা পাইয়াছিলাম, কিন্তু নানা অপব্যয় করিবার পর তাহার অংশবিশেষ মাত্র কেন্দ্রীয় সমিতির তহবিলে পৌঁছিয়াছিল। আমরা যাহা কিছু দিয়াছি, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাহাই সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের টাকা লইতে সুনীতিবাদী ব্যক্তিদের আপত্তি ছিল ; কিন্তু আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া মত করিলেন।

ক্রমশ আমরা ভদ্র গৃহস্থ পরিবারের যুবক ও কুলবধূদের সহিত মেলামেশা করিবার অধিক সুযোগ পাইতে লাগিলাম। অবশ্য পূর্বে যে তাহা ছিল না এমন নয়। দ্বাদশ গোপাল, তারকেশ্বর, কালীঘাট-প্রভৃতি তীর্থস্থানে ও মেলায় আমাদের অবাধ গতিবিধি ছিল, এখনও আছে। তাহাতেও সমাজের কিছু অবনতি ঘটিতেছে। তবে সে সকল স্থলে প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্মানুষ্ঠানে ব্যস্ত থাকে, পতিতা নারীদের সহিত আলাপ-পরিচয় করিবার বিশেষ প্রলোভন অথবা অবসর কাহারও ঘটেনা। কিন্তু এবার অসহযোগ আন্দোলন উপলক্ষ্য করিয়া আমরা যে ভাবে বাহির হইলাম, তাহাতে ভদ্র পুরুষ ও মহিলাদের সহিত আমাদের কথাবার্তা প্রয়োজনবশত অনিবার্যই ছিল। মেলায় অথবা তীর্থস্থলে জনতার মধ্যে পতিতা নারীগণ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে, তাহারা সাধারণের চক্ষে অমন জাজ্বল্যমান হয় না। কিন্তু আমরা ভিক্ষার ছলে অথবা পিকেটিং করিবার জন্য যেমন দলবদ্ধ হইয়া বাহির হইতাম, তাহাতে সর্বসাধারণের মুগ্ধদৃষ্টি আমাদের প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া যাইত না।

মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের অন্তর্গত আরও কয়েকটি প্রধান বিষয় ছিল—অস্পৃশ্যতা-দূর, চরকা ও খদ্দর। আমাদের পতিতা নারীসমাজে ইহার ফল কিরূপ হইয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। অস্পৃশ্যতা-দূর বলিতে মহাত্মা গান্ধী বোধ হয় এই বুঝিয়াছিলেন যে, হাড়ি, মুচি, ডোম, চণ্ডাল, দুলে-বাগদি, সাঁওতাল, দোসাদ প্রভৃতি নিম্নশ্রেণির লোক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিলে তাহাদের পরিবেশিত অন্নজল উচ্চবর্ণের লোক গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং এই সকল অন্ত্যজ জাতির লোক শুদ্ধ দেহে ও পবিত্র পরিচ্ছদে দেবমন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিবে। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর কোনো কোনো ভক্ত বেশ্যাদিগকেও অস্পৃশ্যসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত মনে করিয়া তাহাদিগকে ভদ্রসমাজে 'চল' করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একথা বোধ হয় সকলেই জানেন, পতিতার গৃহে যে সকল ভদ্রলোক গমন করেন, তাঁহারা গোপনে সেই নারীর স্পৃষ্ট সর্বপ্রকার খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করেন—শুধু গ্রহণ করেন বলিলে কথাটা অসম্পূর্ণ থাকে, গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হন। যে কার্যটি গোপনে হইয়া থাকে, তাহা প্রকাশ্যে করাই এই গান্ধীভক্তদের উদ্দেশ্য ছিল।

দেবমন্দিরে প্রবেশ বেশ্যাদের পক্ষে কখনও নিষিদ্ধ হয় নাই। তাহাদের সাজপোশাক দেখিয়া পুরোহিত ঠাকুরের চমক লাগিয়া যায়—প্রচুর দক্ষিণার লোভে, তিনি না বলিতেই দ্বার উন্মুক্ত করিতে আদেশ দেন।

পতিতাদের প্রতি এই অপূর্ব সহানুভূতির ফলে নানাস্থানে পতিতা নারীসঙ্ঘ স্থাপিত হইল। তন্মধ্যে বরিশালের বেশ্যাসমিতিই অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। সেই সময়ে আমার বন্ধু কলিদাসীর বাড়িতে বরিশাল হইতে একটি বারবনিতা আসে। তাহার নাম এখন ঠিক মনে হইতেছে না, বোধ হয় বসন্তকুমারী হইবে। যাহা হউক, এই বসন্তকুমারীকে লইয়া এক তরুণ ছাত্র-যুবক কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যুবকটি কোনো ধনী ব্যবসায়ীর পুত্র। বাপের লোহার সিন্দুক ভাঙিয়া আট শত টাকা লইয়া পতিতা-প্রণয়িনীকে কলিকাতায় আনিলেন। বসন্তকুমারীর মুখে শুনিলাম, বরিশালের এক বিখ্যাত দেশকর্মী দার্শনিক ব্যক্তি তরুণ যুবকদের দ্বারা পতিতালয়ে অসহযোগ মন্ত্র প্রচার করিতেছেন। তথাকার দার্শনিকগণ চরকায় সূতা কাটিতেছে ও খদ্দর পরিধান আরম্ভ করিয়াছে। আমি এত উৎসাহিত হইলাম যে আমিও একটা চরকা কিনিয়া ফেলিলাম, খদ্দরের শাড়ি-ব্লাউজ পরিতে লাগিলাম।

আমার চেষ্টায় রামবাগানে দশ-বারো জন পতিতা নারী চরকায় সূতা কাটিতে লাগিল। কেহ কেহ খদ্দর পরিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু দুই মাসের মধ্যে সব শেষ। চরকা খদ্দর বন্ধ হইয়া গেল। তা হইবার কথা, কারণ সংযম ও পবিত্রতার ভিত্তি ব্যতীত উহা দাঁড়াইতে পারে না।

একদিন দেখিলাম কোনো খবরের কাগজে লেখা হইয়াছে—'কি দুঃখের বিষয়! অশ্বিনীকুমারের[৫২] বরিশালে আজ যুবকেরা পতিতার সংস্পর্শে যাইতে কিছুমাত্র লজ্জিত হয় না।' আমি বসন্তকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ভাই, তোমাদের বরিশালে অশ্বিনীকুমার কে?' বসন্ত বলিল, 'আমি তিন মাস পূর্বে ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া হইতে বরিশালে আসি। অশ্বিনীকুমারের পরিচয় আমি জানি না, উনি বোধ হয় জানিতে পারেন।' বসন্ত তাহার বাবুকে লক্ষ করিয়া বলিল। যুবকটি পার্শ্ববর্তী পালঙ্কের উপর শুইয়া পান চিবাইতে চিবাইতে বিকৃতস্বরে গাহিতেছিলেন।

'এখনও তারে চোখে দেখি নি,
শুধু বাঁশি শুনেছি।
মন প্রাণ যা ছিল তা দিয়ে ফেলেছি—'।

বসন্তের কথায় আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'অশ্বিনীবাবুর নাম শুনেন নি। স্বনামধন্য পুরুষ অশ্বিনীকুমার দত্ত। আপনি এত পড়াশুনা করেছেন, তাঁর 'ভক্তিযোগ' পড়েন নি? একবার পড়ে দেখবেন। পবিত্র চরিত্রের এমন উচ্চ আদর্শ আর কোথাও নাই। অশ্বিনীবাবুর হাতে গড়া বরিশাল।' আমি বলিলাম, 'সেই অশ্বিনীকুমার দত্ত! হাঁ, তাঁর নাম আমি জানি।'

আমি তাঁর মুখের উপর জবাব দিলাম, 'আপনিও সেই বরিশালেরই যুবক না? যুবকটি নির্লজ্জের মত পুনরায় গাহিতে লাগিল—

'শুধু স্বপনে এসেছিল যে,
নয়নকোণে হেসেছিল সে...'

আমি বিরক্ত হইয়া উঠিয়া আসিলাম। আমার মনে হইল, মানুষ এত বড় ভণ্ড হইতে পারে—একটা মহান আদর্শকে প্রশংসা করবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের কার্য দ্বারা অম্লানবদনে তাহাকে পদদলিত করিয়া যায়। যাহা হউক, বসন্তের প্রণয়ী এই যুবকটি আমাকে একদিন অশ্বিনীবাবুর 'ভক্তিযোগ' পুস্তকখানি আনিয়া দিলেন। বলিলেন, 'ইহা আমার উপহার স্বরূপ গ্রহণ করুন।' সেই অবধি আমি 'ভক্তিযোগ' মাঝে মাঝে পাঠ করিতাম।

এই পতিতা-নারী-সমিতির প্রভাব ক্রমশ এতদূর বিস্তৃত হইল যে এক দল সুনীতিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। সঞ্জীবনী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রথমাবধি ইহার বিরুদ্ধে ছিলেন। ওই সংবাদপত্রে তিনি চিরদিন এই সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। হিমাচলের মত দৃঢ়চিত্ত এই মহাপুরুষকে আমি জীবনে কয়েকবার মাত্র দেখিয়াছি ; তাহাতে তাঁহাকে দেবতাসদৃশ্য বলিয়া আমার মনে হইয়াছে। তাঁহার কথা আমি আরও দুইটি পতিতা নারীর মুখে শুনিয়াছি—তাহাদের নাম সুরুচি ও উমাবালা। যথাস্থানে ইহাদের কথা বলা হইবে।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের সম্বন্ধে এখানে আরও দুই-একটি কথা না বলিয়া পারিলাম না। তাঁহার সুনীতি ও পবিত্রতার আদর্শের তুলনায় আমরা অতি হীন, নরকের কীটানুকীট। তথাপি তাঁহার কথা এই জন্য বলিতেছি, তাহাতে আমার চরিত্র আরও পরিস্ফুট হইবে। কৃষ্ণবাবু দুর্নীতিকে কখনও কোনো মিথ্যা অজুহাতে ক্ষমা করেন নাই, কাহাকেও ছাড়িয়া কথা কহেন নাই। রবীন্দ্রনাথ থিয়েটারের অভিনেত্রীদের গান শিখাইতে যান বলিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিয়াছেন, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র পতিতার দান গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার উপরও দোষারোপ করিয়াছেন, ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষ[৩৩] 'সরযূ-সদনে'র সাহায্যার্থে বেশ্যার দ্বারা নাট্যাভিনয় করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার অজস্র নিন্দা করিয়াছেন, শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী[৩৪] মিনার্ভা থিয়েটার বেশ্যাদের সভায় মহিলা ভলাণ্টিয়ারদের নেত্রী হইয়াছিলেন বলিয়া তৎসম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই ব্রাহ্মসমাজের এক একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। আমার সকল প্রণয়ীই ইঁহাকে ভয় করিত।

মহাত্মা গান্ধী যখন বঙ্গদেশ পরিভ্রমণ করেন, তখন তিনি বরিশাল গমন করিলে সেখানকার পতিতা-নারী-সমিতি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী সেই সমিতিতে যান নাই। তিনি বলেন, **'পতিতারা যদি একত্রে মিলিত হইয়া সমিতি গঠন করে তবে দেশের চোর-ডাকাতরাও সমিতি গঠন করিবে।'** [গুরু হরফ সংকলকের] সেই দার্শনিক দেশকর্মী মহাশয় মহাত্মাজীর তিরস্কার লাভ করিয়া এক্ষণে বরিশালের কর্মক্ষেত্র হতেই নাকি চলিয়া গিয়াছেন।

আমাব জীবনেও এদিকে দুর্যোগ ঘনাইয়া আসিতেছিল। রাজনৈতিক আন্দোলনে বাহির হইযা দেশকর্মী যুবকদের মধ্যে বিচরণ করিবার সময় আমি আত্মসংযম করিতে পারি নাই। আমাব কায়িক ও মানবিক অপরাধ হইয়াছে। যেখানে শিক্ষার অভাব, যেখানে শাসন নাই, যেখানে অহংকারই প্রবল, সেখানে এরূপ ত হইবেই। আমার সেই ব্যাঙ্কের কর্মচারী....পাধ্যায় বাবুটি আমার বে-চাল লক্ষ করিয়াছেন, আমার আচরণ সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছেন।

এদিকে তিনিও অপরাধী হইয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে থিয়েটারে একটু বেশী যাওয়া-আসা করিতে দেখিলাম। একদিন থিয়েটারে গ্রীন রুম বা সাজঘরে কোনো অভিনেত্রীর সহিত তাঁহার হাস্যপরিহাসের সময় আমার দৃষ্টি সেই দিকে পড়িল। আমরা দুজনেই থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিলাম। আমাকে বক্সে রাখিয়া তিনি ছল করিয়া বাহিরে গিয়াছিলেন ; গোপনে আমিও গিয়াছিলাম।

আমাদের দুজনেরই হৃদয় বর্ষার বিদ্যুৎপূর্ণ দুইখানি মেঘের মত পরস্পর নিকটে আসিতেছিল। আশঙ্কা করিতেছিলাম, একদিন দিগ্‌দিগন্ত কম্পিত করিয়া দারুণ বজ্রপাত হইবে।

নবম

পঙ্কিল আবর্তে

মদ্যপান বন্ধ করা মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনের আর-একটি কার্য ছিল। তদনুসারে যুবকের দল স্থানে স্থানে মদের দোকানে পিকেটিং করিতে আরম্ভ করে। আমাদের চাকর একদিন বাবুর জন্য মদ আনিতে যাইয়া বাধা পায়। যুবকেরা তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, 'কার জন্য মদ কিনেছিস্?' আমাদের চাকর আমার বাড়ির নম্বর বলিল। তাহারা নাম জানিতে চাহিল। চাকর বলিল, 'ফিরোজা বিবির ঘর।' আমি ফিরোজা রংয়ের জামা-কাপড় পরিতে ভালবাসিতাম বলিয়া রামবাগানে আমার ডাক নাম ছিল ফিরোজা বিবি। চাকরটি তখন কোনো প্রকারে ছাড়ান পাইয়া আসিল।

পরদিন দুপুরবেলায় খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময় চাকর আসিয়া জানাইল, একজন ভদ্রলোক দেখা করিতে চাহেন। আমি তাঁহাকে ঘরে আনিতে বলিয়া বিছানা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। দেওয়ালের গায়ে ঝুলানো বৃহৎ আয়নার সম্মুখে যাইয়া চুল ও পরনের কাপড় ঠিক করিতেছিলাম। অকস্মাৎ এ কি—আয়নার মধ্যে কাহার প্রতিবিম্ব পড়িল? আমি চমকিত হইয়া দরজার দিকে ফিরিয়া দেখি নন্দদাদার এক বন্ধু।

তাঁহার পরিধানে খদ্দরের ধুতি, গায়ে খদ্দরের এক চাদর, পায়ে মাদ্রাজি স্যাণ্ডেল, হাতে একটা মোটা লাঠি। মাথার চুল ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা। আমি কিছু মাত্র বিস্ময়ের ভাব না দেখাইয়া স্পষ্টস্বরে একটু তিরিক্ষি মেজাজে বলিলাম, 'আপনি কে? এ সময়ে আপনার কি প্রয়োজন?' কিন্তু আমার বুক কাঁপিতেছিল।

নন্দদাদার বন্ধু আমার আপাদমস্তক একবার দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, 'মানী, তুমি এখানে?' আমি বলিলাম, 'আমার নাম ফিরোজা বিবি...'। নন্দদাদার বন্ধু ভিতরে আসিয়া বিছানায় বসিয়া লাঠিটা সম্মুখে শোয়াইয়া রাখিল। আমি দাঁড়াইয়াছিলাম। নন্দদাদার বন্ধু আমার ডান হাত ধরিয়া বলিল, 'বোসো না এইখানে।' আমি যন্ত্রচালিতের মত বসিয়া পড়িলাম। মাথা নিচু করিয়া বিছানার চাদর খুঁটিতে লাগিলাম। নন্দদার বন্ধুর নাম উপেন্দ্র।

নন্দদাদার বন্ধু আমাকে বলিল, 'মানী, তুমি শেষে এই করিলে? পড়াশুনার এই পরিণাম?' আমি নন্দদাদার বন্ধুর পায়ে পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। সে বলিল, 'কাল রাত্রিতে মদের দোকানে পিকেটিং করতে এসে তোমার চাকরের মুখে ফিরোজা বিবির ঠিকানা পেয়েছি। আমরা মহাত্মা গান্ধীর মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে মদ্যপান রহিত করিতে প্রতিজ্ঞা করেছি। বেশ্যাদের ঘরেও আমরা এই জন্যে যাই। আজ ফিরোজা বিবির ঘরে আসবার কাজ আমার উপর পড়েছিল। এখানে এসে দেখলাম সে আমারই পরিচিত, মানদা। তা হলে আজ থেকে তোমার ঘরে মদ আসা বন্ধ, মনে রেখো।'

উপেনবাবুর নিকট বাড়ির সমস্ত সংবাদ জানিলাম। বাবা মনোদুঃখে কলিকাতার সমস্ত বাড়ি বিক্রয় করিয়া পল্লীগ্রামে যাইয়া বাস করিতেছেন। আমার মামার (নন্দদাদার পিতার) মৃত্যু হইয়াছে। নন্দদাদা গান্ধীর আন্দোলনে মজিয়াছে। মুকুলদা বি. এল্ পাশ করিয়া...কোর্টে প্র্যাক্‌টিশ করিতেছেন। তাঁহার সাহিত্যচর্চার দিকে বেশি মন থাকায় অর্থোপার্জন কিছুই হয় না। কমলা ম্যাট্রিক পাশ করিয়া ডাক্তারি পড়িবার জন্য পশ্চিমে কোথায় গিয়াছে। তাহার মাতা কলিকাতার বাড়ি ছাড়িয়া এখন কমলার সহিতই সেখানে থাকেন। নন্দদাদা তখনও বিবাহ করেন নাই।

আমি তাহাকে মাঝে মাঝে আসিতে অনুরোধ করিলাম। উপেনবাবু বলিলেন, 'তোমার কাছে যে উদ্দেশ্যে আসা, তা হয়ে গেল। আর মদ কিনবে না, বাস্, আর তো কোনো প্রয়োজন নাই।' উপেনবাবু বিছানা হইতে উঠিলেন। আমি তাঁহাকে কিছু খাইবার জন্য কত মিনতি করিলাম, কিন্তু তিনি কিছু খাইলেন না—একটা পান পর্যন্ত না। এমন চরিত্রবান যুবক কর্মীও আমাদের সংস্পর্শে আসিয়াছেন, যাঁহারা পাপীর সংস্পর্শে আসিয়াও পাপ হইতে দূরে থাকিতে সমর্থ হইয়াছেন। আমার ঘরে আর মদ আসিত না। বাবুর বন্ধুগণ অসন্তুষ্ট হইলেন, বাবুও রাগ করিলেন। উপেনবাবুর কাছে আমি চিঠিপত্র লিখিতাম, সে তাহার সংক্ষিপ্ত উত্তর দিত। আমার বাবু উহা সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। সুতরাং আমাদের মধ্যে মনোমালিন্য দিন দিন বাড়িয়া উঠিল।

নন্দদাদার এই বন্ধুটি আমার পরিচিত। বাল্যকালে তাহাকে আমাদের বাড়িতে অনেকবার দেখিয়াছি। তিনি নন্দদাদার প্রতিবেশী এবং দূরসম্পর্কিত আত্মীয়। নন্দদাদাকে আসিবার জন্য অনেকবার বলিয়া দিয়াছি, কিন্তু তিনি আমার এই পরিণাম শুনিয়া আর আমার নিকট আসেন নাই।

দুই-তিন মাসের মধ্যেই আমার এই . পাধ্যায় বাবু আমাকে ছাড়িয়া দিলেন। যে অভিনেত্রীব সহিত তাঁহাকে হাস্যপরিহাস করিতে দেখিয়াছিলাম, তাহারই ঘরে তিনি যাতাযাত করিতে আরম্ভ কবিলেন। এখন ব্যাঙ্কের টাকায় নটীব পূজা আরম্ভ হইল। অপব্যয়ের ফলে কযেক বৎসরেব মধ্যেই ব্যাঙ্ক ফেল হইল। তিনি নিজেও গেলেন, দেশের লোকেরও সর্বনাশ। অনেক ব্যবসা-শিল্প-প্রতিষ্ঠান নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অনেকের আজীবন-সঞ্চিত ধন, ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ায় তাঁহারা ভিখারি সাজিয়াছেন। আপনারা মূল কারণ অনুসন্ধান করিলে তাহা জানিতে পারিবেন। কোনো পুরাতন বিখ্যাত মাসিক পত্রিকাও তাহার ম্যানেজারের বেশ্যাসক্তির ফলে বিলুপ্ত হইয়াছে।

আমি মনে করিলাম আর কাহারও নিকট বাঁধা থাকিব না। ভাল গায়িকা বলিয়া আমার সুনাম ছিল, আমি সোনাগাছিতে উঠিয়া গেলাম। এইখানে রাজসাহী জেলার কোনো জমিদার যুবক আমার গৃহে আসিতেন। তিনি অতিশয় মদ্যপায়ী ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে প্রায়ই থিয়েটারে যাইতাম। একদিন বক্সে বসিয়া আছি, জমিদারবাবুটি অতিরিক্ত মদ্যপানে একটু মাতলামি আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা জানিতাম না, বাবুর শাশুড়িটি নিকটবর্তী আর-এক বক্সে বসিয়াছিলেন। তিনি না কি পূর্ববঙ্গের কোনো বিশিষ্ট জমিদার গৃহিণী। জামাতার এইরূপ লজ্জাজনক আচরণ দেখিয়া তিনি আমাদের নিকট হইতে জামাতাকে তখনি নিজগৃহে লইয়া গেলেন। এখন সেই জমিদারবাবুটি সত্যবালা নাম্নী আমার পরিচিতা এক পতিতার ঘরে যান। সমাজে তাঁর মান মর্যাদা যথেষ্ট।

আমি মাঝে মাঝে বাগান অথবা মজলিসে গানের মুজ্‌রায় যাইতাম। ইহাতে অর্থোপার্জন হইত বটে, কিন্তু বিপদও ছিল। বড়লোকের খেয়াল মাফিক চলা যে কি বিরক্তিজনক, তাহা বুঝাইবার সাধ্য আমার নাই। সারারাত্রি জাগরণ, ভালবাসার ভান, মাতলামির ঝঞ্ঝাট—এই সব করিতে শরীর-মন একবারে অবসন্ন হইয়া পড়িত। ভাবিতাম—আর না, সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলি। হৃদয়ে দারুণ অনুতাপ উপস্থিত হইত। কিন্তু প্রলোভন কখনও জয় করিতে পারি নাই, বার বার ঘূর্ণিপাকে পড়িয়াছি।

১৯২৪ সালের বর্ষাকালে তারকেশ্বরের সত্যাগ্রহ আরম্ভ হয়। বর্তমানে মোহান্ত সতীশ গিরির বিরুদ্ধে পূর্বাবধি নানাবিধ অত্যাচারের অভিযোগ ছিল।[৫৫] তদনুসারে দেবোত্তর সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের জন্য গভর্নমেণ্ট রিসিভার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বামী সচ্চিদানন্দ ও বিশ্বানন্দের নেতৃত্বে মহাবীরদল রিসিভারের মন্দির প্রবেশে বাধা দেন। এদিকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে কংগ্রেসীদল প্রবেশাধিকার দাবি করেন। তাঁহারা বলেন, মোহান্তের কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকিতে পারে না। এই প্রাসাদের মধ্যে যে মূর্তি আছে, তাহা দর্শন ও পূজা করিবার অধিকার জনসাধারণের আছে। এই গোলযোগের মধ্যে মহাবীরদল, গভর্নমেণ্ট, মোহান্ত, কংগ্রেস সকলে জড়াইয়া পড়িল। মারামারি লুটপাট প্রভৃতি তুমুল কাণ্ড চলিতে লাগিল।

কলিকাতা হইতে আমরা প্রায় দশ-বারো জন পতিতা নারী তারকেশ্বরে যাত্রা করি। সেখানে যাইয়া দেখিলাম হুগলী, শ্রীরামপুর, শেওড়াফুলি-প্রভৃতি স্থান হইতে আরও বেশ্যা আসিয়াছে। আমরা সকলে মিলিয়া মহিলা-ভল্যাণ্টিয়ারদল গঠন করিলাম। সত্যাগ্রহ পরিচালনা করিবার জন্য আমরা কিছু টাকা চাঁদাও তুলিয়াছিলাম।

মোহান্তের প্রাসাদের সম্মুখে সত্যাগ্রহ করিতে কংগ্রেসীদল আমাদিগকে দিল না। মন্দির রক্ষা করাই আমাদের প্রধান কার্য হইল। স্বামী সচ্চিদানন্দকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিতে আসিলে আমরা তাঁহার চারিদিকে ঘেরিয়া বসিলাম। পুলিশ বিফলমনোরথ হইয়া চলিয়া গেল। আমরা পালা করিয়া মন্দিরের দ্বারে প্রহরীর কার্য করিতে লাগিলাম।

ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র গুহ রায়[৩৬] ও শ্রীযুক্তা সন্তোষকুমারী গুপ্তা ইঁহারাই তারকেশ্বরের সত্যাগ্রহের প্রধান পরিচালক ছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন একদিন যাইয়া আমাদের সকলকে উৎসাহিত করিয়া আসেন। আমাদের সুখ ও স্বচ্ছন্দতার জন্য প্রচুর অর্থব্যয় হইয়াছে। সত্যাগ্রহ তহবিলে বহু সহস্র টাকা উঠিয়াছিল। যথাসময়ে তারকেশ্বর-সমস্যার একপ্রকার মীমাংসা হয়। কিন্তু সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় সেখানে যে বীভৎস ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা আজও ভুলিতে পারি নাই। মহিলা ভল্যাণ্টিয়ার নামধারী বেশ্যাদের সহিত বিভিন্ন দলের ভল্যাণ্টিয়ার নামধারী অনেক ভণ্ড লম্পটের অবাধ কলুষিত সংযোগ, যাঁহারা দেশকর্মী বলিয়া পরিচিত তাঁহাদের কাহারও রাত্রিযাপন-সমস্যা, আমার নিকট কোনো সত্যাগ্রহী ব্যক্তির প্রস্তাব—এই সব দেখিয়া মনে হইয়াছে তারকেশ্বরে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তথায় পুণ্যের আলোক নিভিয়া গিয়াছে।

সেখানে দেবদর্শনার্থী সুকৃতি নাম্নী এক যুবতীর সহিত আমার পরিচয় হয়। সাবিত্রী নামে সুকৃতির এক ভগ্নী ছিল। ইহারা কলিকাতা জোড়াসাঁকো-পল্লীর বিখ্যাত উচ্চবংশের কন্যা। লোকে বলে এই বংশে লক্ষ্মী-সরস্বতীর বিবাদ নাই। সুকৃতি ও সাবিত্রী উভয়েই পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া শোভাবাজারে বাস করে।[৩৭] গভর্নমেণ্টের একজন উকিল সুকৃতির ঘরে যাতায়াত করিয়া থাকেন। কিছুকাল পূর্বে সাবিত্রীর মৃত্যু হইয়াছে। একজন বড় দেশকর্মী তাহার কাছে যাইত। যে সকল পরিবার বাংলার গৌরব, তাহাদের আজ এ কি অধঃপতন। ইহার নিকট বাংলার বহু বিখ্যাত ব্যক্তির যে ইতিহাস শুনিয়াছি, তাহা লিখিলে হয়ত আইনের দায়ে পড়িতে [হইবে], এজন্য লিখিলাম না। এই পরিবারই অবাধ মেলামেশার পথপ্রদর্শক।

উপেনবাবুর নিকট শুনিয়াছি, নন্দদাদার সংযম অটুট রহিয়াছে। কোনো নারী তাহার সম্মুখে প্রলোভন লইয়া আসিতে পারে নাই। অসহযোগ আন্দোলনের ভাল দিকটা তাহার পূর্ব-গঠিত চরিত্রকে আরও সুদৃঢ় করিয়া তুলিয়াছে। বিলাসশূন্যতা ও সৎকার্যে আসক্তি এই দুইটি তাহার ব্রহ্মচর্যের প্রধান সহায়। আমার মত সাহিত্যচর্চা না করা নন্দদার পক্ষে মঙ্গলজনক হইয়াছে। দারিদ্র্য তাহার বন্ধুর কার্য করিয়াছে। এমন নির্মল চরিত্রের কর্মীও আছে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অল্প।

আমার সম্বন্ধে নাকি এই কথা বলিত, 'মানদা, যদি তার পাপজীবনের সমস্ত ঐশ্বর্য ছেড়ে একবস্ত্রে আমার কাছে আসে, আমি তাকে আদরের সহিত মাথার মণি করে রাখব, বোন বলে তেমনি স্নেহ করব। কিন্তু সে পতিতাপল্লীতে পতিতাবৃত্তিতে থাকিলে আমি তাহার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ রাখতে পারি না।'

আমি কখনও সিগারেট অথবা মদ খাই নাই। পতিতা নারীদের এই অভ্যাস অর্থোপার্জনের অনুকূল নহে। আমার বাবুগুলি আমাকে এই নেশা দুইটি ধরাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই সফলকাম হন নাই। উপেনবাবু মদ্যপান নিবারণের জন্য বেশ্যাদের গৃহে পিকেটিং অনেকদিন চালাইয়াছেন। আমি যথাসাধ্য তাঁহার সাহায্য করিয়াছি।

পূজার ছুটি, বড়দিনের অবকাশ—প্রভৃতি উপলক্ষ্যে মফস্‌সলের উকিল ও অফিসের কর্মচারীগণ কলিকাতায় আসিয়া থাকেন। তখন আমাদের গৃহে তাঁহাদের অনেকের শুভাগমন হয়। যাঁহারা জমিদার ও ব্যবসায়ী, তাঁহারা অন্য সময়েও আসিতে পারেন। অনেকে মফস্‌সল হইতে এখানে তাঁহাদের রক্ষিতাদিগকে মাসে-মাসে টাকা পাঠাইয়া থাকেন। নোয়াখালির এক রায়-বাহাদুর, বর্ধমানের এক জমিদার, ঢাকার এক বড় ঔষধ ব্যবসায়ী, রংপুরের এক উকিল—ইঁহাদের নিকট হইতে আমি কিছু টাকা পাইতাম। চীৎপুরে বিশিষ্ট সোনার বেনের মেয়ে প্রভা নামে আমার এক বন্ধু আছে। ময়মনসিংহের এক উকিল তাহার বাবু, ঢাকার সেই ব্যবসায়ীর সহিত ইহার নাকি পরিচয় ছিল। সেই সূত্রে ঢাকার লোকটি আমার ঘরে আসিত। প্রভার বাড়িতে কলিকাতার এক ব্যারিস্টারের কুমারী কন্যাও আছেন। এইরূপে নিত্য নূতন লোক লইয়া সোনাগাছিতে আমার দিন কাটিতে লাগিল। বিশিষ্ট ঘরের পতিতা মেয়েদের সঙ্গে আমি একটু বেশি মেলামেশা করিতাম। এই ব্যারিস্টার কন্যার মত নির্ভীক পতিতা আমি কম দেখিয়াছি।

এই সময়ে একটি শোচনীয় দুর্ঘটনা আমার প্রত্যক্ষ হইল। আমি এস্থলে তাহার বর্ণনা করিতেছি। তাহাতে বুঝা যাইবে, কি ঘোরতর পাপ সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। ইহার প্রতিকার কিরূপে হইতে পারে তাহাও সমাজপতিদের ভাবিয়া দেখা কর্তব্য।

কলিকাতার মধ্যভাগে বাদুড়বাগান-পল্লীর নিকট এক জমিদার বাস করিতেন। তাঁহার পূর্বপুরুষ নাকি সুপরিচিত বিখ্যাত ব্যক্তি। সেই জমিদার অতিশয় দুশ্চরিত্র। প্রতিবেশী গৃহস্থদের কুলবধূর উপর তাঁহার কুদৃষ্টি। তাঁহার দুষ্কার্যের সহায় কতকগুলি বন্ধু ও অনুচর আছে। ইহারা নানা কৌশলে গৃহস্থের কুলবধূদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া প্রভুর কাম-লালসা তৃপ্তির জন্য লইয়া আসে। কখনও কলিকাতার প্রাসাদে, কখনও বা নিকটবর্তী বাগানবাড়িতে এই সকল পাপলীলার অনুষ্ঠান হয়।

গৃহস্থের কুলবধূরা কেহ প্রলোভনে স্বেচ্ছায়, কেহ বা অনিচ্ছায় বাধ্য হইয়া আসিয়া থাকে। তাহারা অনেকেই গান জানে না, মদ্যপানও করে না। এইপ্রকার আমোদের জন্য সোনাগাছি অথবা রামবাগান হইতে নারীদিগকে নেওয়া হইত। আমি জমিদারের বাগানবাড়িতে

দুই-একবার গিয়াছিলাম। প্রতিরাত্রিতে একশত টাকা লইতাম, গান গাওয়াই আমার কার্য ছিল। আমি মদ খাইতাম না। আরও দুই-তিনটি বেশ্যা যাইত। তাহারাই মদ্যপানের আমোদে যোগ দিত।

এক রাত্রিতে জমিদারের বাগানবাড়িতে আমার যাইবার ডাক পড়িল। আমি আমার পাওনা টাকাকড়ি অগ্রিম লইয়া রাত্রি আটটার সময় তথায় যাই। দেখিলাম, একটি সুন্দরী যুবতী কুলবধূকে আনয়ন করা হইয়াছে। তাহার বয়স ১৮/১৯ এইরূপ হইবে। গায়ের রং যেন কাঁচা সোনা—মুখখানি কোমল, লাবণ্য মাখা। আমার প্রাণে বড় ব্যথা বাজিল। এই দুর্বৃত্ত জমিদারের পাপ প্রবৃত্তির কবলে কত সতীর বলিদান দেখিয়াছি। আমরাও এই পাপের ভাগী। সে রাত্রিতে গানে আমার মন লাগিল না। আমি এই বধূটির সহিত কথাবার্তার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলাম।

আমোদপ্রমোদ আরম্ভ হইল। জমিদার ও তাঁহার বন্ধুগণ মদ্যপান করিতে লাগিলেন। আমি দুই-একটি গান গাহিলাম। অন্যান্য বেশ্যারাও তারপর নাচিতে-গাহিতে আরম্ভ করিল। আমি গরমের অছিলায় বাহিরে আসিবার সময় সেই বধূটিকে আস্তে আস্তে বলিলাম, 'চল, একবার বাগানে বেড়াইয়া আসি।' আমরা উভয়ে পুকুরের ঘাটে একটি বেদীর উপরে বসিলাম। তাহার সহিত আমার অনেক কথা হইল। তাহার সারমর্ম এই : বধূটির নাম অপরাজিতা দেবী। সে ব্রাহ্মণকন্যা। বর্ধমান জেলার কোনো গ্রামে তাহার পিত্রালয়। কলিকাতার কোনো মুখোপাধ্যায়-যুবকের সহিত নাকি বিবাহ হইয়াছে। তাহার স্বামী পিসিমার কাছে থাকেন। এই পিসিমায়ের কয়েক ভগ্নী, নিজ নিজ বাড়িতে বাস করেন। তাহার স্বামীর পিতামাতা বা অপর কোনো আত্মীয়স্বজন বোধ হয় নাই। তিনি অতি নিরীহ ও শান্ত স্বভাব। সর্বদা পিসিমার মন যোগাইয়া চলেন। পিসিমার মৃত্যুর পর বাড়ি ও নগদ টাকা নাকি পাইবেন, ইহা তাঁহার আশা ছিল।

অপরাজিতার পিসশাশুড়ি নাকি বিধবা অবস্থায়...অর্থ উপার্জন করিয়াছেন, এইরকম দুর্নাম আছে। এক্ষণে বার্ধক্যে নিজে অশক্ত হওয়ায় ভ্রাতুষ্পুত্রের বধূদের সতীত্বের বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করেন। অপরাজিতার স্বামীর পূর্বে আরও দুইবার বিবাহ হইয়াছিল। পর-পর সেই দুইটি বধূর অগ্নিদাহে মৃত্যু হয়। পিসশাশুড়ি প্রকাশ করেন যে, বধূরা নিজের দেহে আগুন লাগাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। অপরাজিতা তাহার স্বামীর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী, তাহার একটি শিশুপুত্র আছে।

অপরাজিতাকেও তাহার পিসশাশুড়ি অর্থ উপার্জন করিতে নিযুক্ত করেন, অপরাজিতা তাহাতে সম্মত নহে। ইহাতে পিসশাশুড়ি তাহার উপর দিনরাত্রি উৎপীড়ন করিতেন। এক দুষ্ট ডাক্তার পিসশাশুড়ির প্রধান মন্ত্রদাতা ও দুষ্কার্যের সহায় ছিল ; অপরাজিতা এতদিন তাহার সতীত্ব রক্ষা করিয়া আসিয়াছে।

আমি অপরাজিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি এখন কি করবে? তুমিও কি আত্মহত্যা করতে চাও?' অপরাজিতা বলিল, 'আত্মহত্যা করব কেন? আমার বাবা আছেন, ভাই

আছেন, আমার ছেলে আছে—আমি আত্মহত্যা করব না।' আমি এই কিশোরী বধূর দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও অপূর্ব আত্মসংযম দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলাম। এই বালিকা কোনো শিক্ষা পান নাই, লেখাপড়া জানে না, সাহিত্যচর্চা করে নাই, অথচ ইহার মধ্যে এমন তেজ ও শক্তি কোথা হইতে আসিল?

আমি বলিলাম, 'তুমি যদি ইহাদের কুপ্রস্তাবে সম্মত না হও তবে কি হবে তা জান?' অপরাজিতা বলিল, 'হাঁ জানি, এরা আমাকে মেরে ফেলবে। আমার পিসশাশুড়ি আমার ওই দুই সতীনকেও মেরে ফেলেছেন, তারপর লোকের কাছে বলেছেন যে উহারা কাপড়ে কেরোসিন তেল দিয়ে আগুন লাগিয়ে মরেছে। কিন্তু মানুষ এত বোকা নয় যে, সে কথা আর বিশ্বাস করবে ; পর-পর দুইটি বৌ একই রকমে মারা যায়। আজ সারাদিন পিসশাশুড়ির সহিত আমার ঝগড়া হয়েছে। আমি বলেছিলাম যে, আমি সমস্ত কথা প্রকাশ করে দিব। শাশুড়ি আমাকে বলেন, তা হলে তোর গলায় পা দিয়ে একেবারে তোর জীবন শেষ করব। আমিও সেই থেকে প্রতিজ্ঞা করেছি, এরা জীবিত অবস্থায় যেন আমার অঙ্গ স্পর্শ করতে না পারে।'

অপরাজিতার কথা শুনিতে আমার মাথা লজ্জায় নুইয়া পড়িল। ভাবিলাম, অপরাজিতা কোন্ স্বর্গের দেবী—আর আমি কোন্ নরকের কীট। হিন্দুসমাজে কেবল আমার মত কলঙ্কিনীই জন্মগ্রহণ করে না, অপরাজিতার মত সতীও জন্মগ্রহণ করেন। আমার দেহের দূষিত বাতাসে অপরাজিতার পবিত্রতা নষ্ট হইয়া যাইবে, এই ভাবিয়া তাহার সহিত আর অধিকক্ষণ কথা কহিলাম না। দেখিলাম, তাহার পিসশাশুড়ি ও আর-একজন লোক (অপরাজিতা বলিল, লোকটি নাকি...ডাক্তার) সেই দিকে আসিতেছেন। আমি অপরাজিতার পায়ের ধূলা নিয়ে তাহাকে প্রণাম করিলাম। সে অগ্রসর হইয়া গেল, আমি একটা লতাকুঞ্জের অন্তরালে দাঁড়া[ই]লাম।

সে রাত্রিতে আমি আর আমোদপ্রমোদে যোগ দিলাম না। শরীর অসুস্থ বলিয়া শীঘ্র চলিয়া আসিলাম। দুঃস্বপ্নে ভাল ঘুম হইল না। দুই দিন পরে কাগজে পড়িলাম, অপরাজিতার মৃত্যু হইয়াছে। তাহার পিস্‌শাশুড়ি পুলিশের নিকট জানাইয়াছে, সকালবেলা উনুনের আঁচ ধরাইবার সময় অসাবধানে কাপড়ে আগুন লাগিয়া অপরাজিতার মৃত্যু ঘটে। শবদেহের ডাক্তারী পরীক্ষায়, পুলিশ তদন্তে ও করোনারের বিচারে প্রকৃত রহস্য প্রকাশিত হইল না। এই ঘটনার পর প্রায় সপ্তাহকাল পর্যন্ত আমি নিতান্ত মানসিক উদ্বেগ ও অশান্তিতে কাটাইয়াছি। এখনও অপরাজিতার মুখখানি আমার মনে আছে।

এদেশের ঘরে ঘরে এমন কত শোচনীয় দুর্ঘটনা হইতেছে, সে সংবাদ কি সমাজের কর্তারা রাখিয়া থাকেন?—সতীশিরোমণি বালিকাবধূর অভিশাপে সমাজ রসাতলে যাইতেছে। দুর্বৃত্ত লম্পটেরা অর্থের বলে মানমর্যাদা আদায় করিয়া সমাজের মধ্যে নির্ভয়ে বুক ফুলাইয়া বেড়ায়।

কালিদাসী একদিন আমার বাড়িতে আসিল ; তাহার চেহারা দেখিয়া বুঝিলাম, সে অতিশয় দুরবস্থায় পড়িয়াছে। তাহার মুখে শুনিলাম, রেস (ঘোড়দৌড়ের জুয়াখেলা) খেলিয়া এবং মদ খাইয়া তাহার সেই ভাটিয়াবাবু সর্বস্বান্ত হইয়াছে। তাহার কারবার উঠিয়া গিয়াছে। কালিদাসী এখন এক মাড়োয়ারির কাছে বাঁধা। কিন্তু হাতে টাকাকড়ি নাই। আমার কাছে গহনা বন্ধক রাখিয়া পাঁচ শত টাকা কর্জ চায়।

যাহারা পতিতালয়ে যাতায়াত করে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকের দুইটি প্রধান নেশা জন্মে—ঘোড়দৌড়ের জুয়াখেলা এবং মদ্যপান। রেস খেলিয়া অনেকে হাজার-হাজার টাকা পায়, এইরূপ শুনা যায়, কিন্তু তাহা থাকে না ; যে পথে উৎপত্তি, সেই পথেই নিষ্পত্তি। রেসের দিন বেশ্যাপল্লীতে খুব ভিড়। যে খেলায় জিতিয়া কিছু লাভ করিয়াছে, সে যেমন আমোদ করিতে সেখানে যায়—যে হারিয়া সমস্ত খোয়াইয়াছে সেও তেমন দুঃখ ভুলিতে সেখানে ছুটিয়া যায়।

আমার হাতে টাকা ছিল না। ঊষাবালা নামে একটি স্ত্রীলোক আমাদের বাড়িতে নূতন আসিয়াছিল, তাহার কাছে কিছু নগদ টাকা আছে জানিতাম। কালিদাসী যে গহনা আনিয়াছিল, তাহার মূল্য প্রায় এক হাজার টাকা। সুতরাং আমার কথায় সম্মত হইয়া ঊষাবালা ওই গহনা বন্ধক রাখিয়া কালিদাসীকে পাঁচ শত টাকা দিল।

আমি পরে জানিয়াছি, কালিদাসী রেস খেলিয়া মদ খাইয়া সে টাকাও উড়াইয়াছে। ভাটিয়াবাবুর সংসর্গে কালিদাসীকে রেস ও মদের নেশায় পাইয়াছিল। এই পথেই সে উচ্ছন্নে গিয়াছে। আমি আরও জানিলাম, এই নূতন মাড়োয়ারি যুবকটির সহিত কালিদাসীর পূর্ব হইতেই গুপ্তপ্রণয় ছিল। এইসব দেখিয়া-শুনিয়া তাহার প্রতি আমার আর বিন্দুমাত্র সহানুভূতি রহিল না। ঊষাবালার ঋণ সে আর শোধ করিতে পারে নাই।

কালিদাসী এখনও বাঁচিয়া আছে। সে আমারই মত তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে। কিছুদিন পূর্বে তাহাকে কলিকাতার কোনো অপরিচ্ছন্ন বস্তিতে এক বিড়িওয়ালা মুসলমান যুবকের সহিত যেভাবে ইয়ার্কি করিতে দেখিলাম, তাহাতে বুঝিতে পারিয়াছি পতিতাদের শীঘ্র মরণ হয় কেন। সেই ২৬ বৎসরের যুবতীর দেহ ৬০ বৎসরের বৃদ্ধের মত ক্ষীণ, শুষ্ক, অস্থিচর্মসার ; মদ্যপানের ফলে নানা রোগের আক্রমণ, পরনে একখানা কাপড়ই যথাসর্বস্ব, দুই বেলা আহার জুটে না—তার উপর অত্যাচার। আমি কালিদাসীর সহিত কথা কহিলাম না। মোহান্তজীর উপদেশ আমার মনে হইল—'দৈবকে অতিক্রম করিবার শক্তি কাহারও নাই। কর্মফলই দৈব।'

ঊষাবালার কথা এইখানেই বলিব। সে ফরিদপুরের কোনো ব্রাহ্মণ উকিলের পরিণীতা স্ত্রী, পিত্রালয় হইতে কয়েকজন ধনী মুসলমান তাহাকে অপহরণ করিয়া কলিকাতার নিকটবর্তী বেলিয়াঘাটায় রাখে। নারীরক্ষাসমিতির কর্মী শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র আতর্থী মহাশয় সংবাদ পাইয়া তাঁহার কর্মীদের দ্বারা ও পুলিশের সাহায্যে ঊষাবালাকে উদ্ধার করেন। এইজন্য পুলিশ-আদালতে মামলা চলিতে থাকে। তাহার স্বামী তাহাকে স্ত্রী বলিয়া অস্বীকার

করেন। উষাবালা কিছুদিন সঞ্জীবনী-সম্পাদক, নারীরক্ষাসমিতির পরিচালক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের বাড়িতে অবস্থান করে। এই উষাবালার কথাই আমি পূর্বে একবার উল্লেখ করিয়াছি। সে আমার নিকট বলিয়াছে, 'কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় আমাকে নিজ কন্যার মত দেখতেন। তিনি আমাকে লেখাপড়া শিখাইবার ব্যবস্থা করলেন ; শিল্পকাজ শিখবার জন্য এক স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। কিন্তু আমি কিছুতেই মনস্থির করতে পারলাম না। দুষ্প্রবৃত্তি দমন করা আমার পক্ষে অসাধ্য হয়ে উঠল। আমার বয়স আঠারো বৎসরের বেশি, সুতরাং তাঁরা আমাকে আর জোর করে রাখতে পারেন না। নানা অবস্থার পাকচক্রে ঘুরে আমি এই পথে এসেছি। কিছুদিন আমাকে রাস্তায় বসে পান বিক্রিও করতে হয়েছিল।'

নারীনিগ্রহের বিশেষ উপদ্রব আরম্ভ হইলে আমি একজন ভদ্রলোককে প্রায়ই বেশ্যাদের ঘরে আসিতে দেখিতাম, তিনি আমাদের নিকট তারকবাবু নামে পরিচিত, পতিতাদের মধ্যে চারি-পাঁচজন তাঁহার বিশ্বাসভাজন ছিল, আমাকেও তিনি বিশ্বাস করিতেন। আমরা ইহা বিশেষরূপে লক্ষ করিয়াছি, তিনি কোনো কুমতলবে বেশ্যালয়ে আসেন না। তিনি নারীরক্ষা সমিতির কর্মী—না পুলিশের গোয়েন্দা, তাহা জানি না ; কিন্তু আমাকে তিনি বলিয়াছেন, আজকাল অনেক দুর্বৃত্ত গৃহস্থ ঘরের মেয়ে-বৌকে চুরি করিয়া বেশ্যাগৃহে লুকাইয়া রাখে, কোনো স্ত্রীলোক কলঙ্কের ভয়ে বাধ্য হইয়া প্রণয়ীর সহিত স্বেচ্ছায় পতিতালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে—এইসব সন্ধান লইবার জন্যই তিনিই গোপনে বেশ্যাদের নিকট যাতায়াত করিয়া থাকেন। আমরা তাঁহার কার্যে যথাসাধ্য সাহায্য করিতাম।

একদিন তারকবাবু আমাকে বলিলেন, 'তোমাদের সম্মুখের সমস্ত বাড়িটা ভাড়া নিয়ে যে নূতন মেয়েটি রয়েছে, তার সম্বন্ধে একটু বিশেষ খোঁজ করে দেখবে, আমার প্রয়োজন আছে।' আমি তার পরদিন হইতে সেই বাড়িতে যাতায়াত করিতে লাগিলাম। অল্পদিনের মধ্যেই মেয়েটির সহিত আমার ভাব হইল। তার ভিতরের কথা অনেকটা জানিলাম।

কয়েকদিন পর তারকবাবু আসিলে আমি বলিলাম, 'মেয়েটি ব্রাহ্মণ বংশীয়া—নাম সুরুচিবালা, তাহার পিতা একজন অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার, এখন কাশীতে আছেন, হুগলি জেলার কোনো ব্রাহ্মণ যুবকের সহিত সুরুচির বিবাহ হয়। সুরুচি বলে যে, তাহার স্বামী আর এক বিবাহ করিয়াছিল। সুরুচির স্বামীগৃহে স্থান হয় নাই। সে কাশীতে পিতার নিকট থাকিত। বাল্যকাল হইতে উপন্যাস-নাটক-নভেল পড়ার তার খুব ঝোঁক ছিল। ক্রমশ সে উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির হইয়া উঠে। পিতামাতার শাসন সে মানিত না, কাশীতে দুষ্ট লোক অনেক আছে, সুরুচি কোনো দুর্বৃত্তের সহিত পলায়ন করিয়া কলিকাতায় আসে। এখানে অনেকের হাতে পড়িয়া সে কলুষিত হয়। পুলিশ তাহাকে আপত্তিজনক অবস্থায় পাইয়া গ্রেপ্তার করে, পুলিশ আদালতে তাহাকে নেওয়া হইলে বিচারক বিষম সঙ্কটে পড়িলেন, নারীরক্ষাসমিতির অক্লান্ত কর্মী ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র আতর্থী মহাশয় সেদিন অন্য কোনো কার্য উপলক্ষ্যে আদালতে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে বিচারক চিনিতেন। তিনি

মহেশবাবুকে বলিলেন, 'আপনি এই মেয়েটিকে নিয়ে যান, নারীরক্ষাসমিতি হইতে ইহার যথোচিত ব্যবস্থা করুন।'

সুরুচি কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের ঘরে আশ্রয় পাইল, তিনি পিতৃস্নেহে ইহাকে সৎপথে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সুরুচি এই সরলপ্রাণ, উদারহৃদয়, মহানুভব ব্যক্তিকে প্রতারণা করিয়া চলিয়া আসিল, দুষ্ট লোকের প্রলোভনে পড়িয়া সে পাপের পথই বাছিয়া লইল। এক্ষণে এক ধনী পার্শি যুবক তাহাকে বাঁধা রাখিয়াছে, মেমসাহেবদের স্টাইলে সে থাকে—ঘাড়ের উপর পর্যন্ত ছোট করিয়া চুল ছাঁটা, হাঁটু পর্যন্ত স্কার্ট, খোলা হাতের রঙের সহিত মানানসই সিল্কের মোজা, পরিষ্কার হিন্দি বলে ; ইংরাজিও কিছু শিখেছে।'

তারকবাবু সমস্ত মনোযোগের সহিত শুনিয়া বলিলেন, 'সে কৃষ্ণবাবুর বাড়ি হইতে পলাইল কেন, তাহা বুঝি জান না।' আমি বলিলাম, 'না, সে কথা সুরুচি বলে নাই।' তারকবাবু বলিলেন, 'সে কৃষ্ণবাবুর জামাতা শচীনবাবুর একটি সোনার ঘড়ি সরাইয়াছিল, এজন্য মহেশবাবু তাহাকে পুনরায় আদালতে দিয়া আসেন। তথায় সে বেশ্যাবৃত্তি করিবার অনুমতি চায়, বিচারক অগত্যা তাহাকে তথাস্তু বলিয়া ছাড়িয়া দেন।'

আমাদের এইরূপ কথাবার্তা হইতেছিল এমন সময় সুরুচি হাসিতে হাসিতে আমার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল, তাহার হাতে নানাবিধ ফল, ফুল ও কেক বিস্কুট—প্রভৃতি রহিয়াছে, আমি তাহাকে বসিতে বলিলাম, সে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল, 'মানদি, আজ মোটরে চড়ে হগ্‌সাহেবের বাজারে গিয়েছিলুম, এইসব কিনে এনেছি, কাল সকালে আমাদের বাড়িতে তোমার চা-এর নিমন্ত্রণ, যেও। ভাল কথা, আজ সেই বুড়ো মহেশ আতর্থীর সঙ্গে দেখা হল, আমি বললুম, কি বুড়ো, কেমন আছো?'

তারকবাবু সুরুচির সম্বন্ধে কি করিয়াছিলেন জানি না, আমি সুরুচি ও উষার কথা ভাবিয়া দেখিলাম, ইহারা আমারই মত হতভাগিনী। যৌবনের প্রারম্ভে প্রলোভনের বশীভূত হইয়া সংযমের বাঁধ একবার ভাঙিয়া গিয়াছে—আর তো অকূল সমুদ্রে কূল পাইতেছে না। ইহারাও আমার মত সৎপথে আসিবার সুযোগ পাইয়াছিল ; কিন্তু আমারই মত ইহাদের অদৃষ্টেও বোধ হয় আরও দুঃখভোগ আছে, তাই অনিবার্য কর্মফল কেহ খণ্ডাইতে পারিল না।

দশম

অভিনব পন্থা

সোনাগাছিতে আসিবার পর আমার উপার্জন অনেক কমিয়া যায়। শরীরও নানা রোগাক্রমণের ফলে ক্রমশ ক্ষীণ ও দুর্বল হইতে থাকে, খাওয়াপরা, ঠাকুর-চাকর-ঔষধাদি-বাবদে বহু টাকা আমার খরচ হইত। পূজা-পার্বণও কিছু করিতাম, বিশেষত সরস্বতী পূজা আমার কখনও বাদ যাইত না, আমার রোজগারে আর কুলাইয়া উঠিত না।

একজন উকিল ও একজন ব্যারিস্টার আমার ঘরে আসিত, ইহারা আইন-ব্যবসায়ে যেমন পরস্পর সহযোগী ছিল আমার কাছেও সেইভাবেই যাওয়া-আসা করিত। আমাদের পতিতা নারীসমাজেব একটি রীতি এখানে উল্লেখ করিতেছি। বাবুর বন্ধু বা পরিচিত বন্ধুদের সহিত কুভাবে আসক্ত হওয়া পতিতা নারীর পক্ষে নিন্দার বিষয় ; অবশ্য প্রলোভনের বশীভূত হইয়া অনেক বেশ্যা গোপনে এই নিয়ম পদদলিত করিয়া থাকে, কিন্তু পতিতাসমাজে তাহার দুর্নাম রটে। ভদ্রসমাজে অনেকসময় যে সকল বন্ধুবিচ্ছেদ দেখা যায় তাহার কতক এই বেশ্যাপল্লীর বাবু ও বন্ধু লইয়া ঘটে, এমন কি ইহার ফলে মারামারি খুনোখুনি পর্যন্ত হইয়া যায়।

আমি অভাবে পড়িয়া অর্থলোভে এই দুই বন্ধুকে প্রণয়ীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম। তাহাদের মধ্যেও কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব দেখি নাই।

আমার এ প্রকার কার্যের জন্য পতিতারা অনেকে আমায় নিন্দা করিত, আমি ভাবিতাম সমুদ্রে যার শয়ন, শিশিরবিন্দুতে তার কি ভয়? পতিতাই যখন হইয়াছি তখন কলঙ্কের পসরা তো মাথায় নিয়াছি ; 'বলিদান' নাটকের পাগলির সেই গানটি মনে পড়ে।

কলঙ্ক যার মাথায় মণি,
লুকানো প্রেম তারই সাজে,

নরকে যখন ডুবিয়াছি তখন একেবারে ইহার গভীর তলায় যাইয়া দেখি পরতে-পরতে কত রকমের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে।

ক্রমশ দেখিলাম, এই উকিল-ব্যারিস্টার বাবুদের পরিচয়ে দুই-একজন উঁচুদরের লোক আমার ঘরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের নিকট অনেক টাকা পাইলাম। আমার মাথায় এক নূতন ফন্দি আসিল। আমি জানিতাম, কলিকাতার অনেক বড় বড় লোকের কাছে এই উকিল ব্যারিস্টারদের যাতায়াত ও আলাপ-পরিচয় আছে। সেই সকল বড় লোককে আমার ঘরে আনিবার জন্য আমি ইহাদিগকে নিযুক্ত করিলাম, কথা রহিল, টাকার অর্ধেক তাহারা দুইজনে পাইবে।

আমি এবার খাঁটি বেশ্যা হইলাম। রামবাগানে থাকিতে নিম্নশ্রেণির লোকেরা রাস্তা হইতে দুই-একটি বাবুকে ফুসলাইয়া আমার ঘরে আনিত। পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেবের শাসনে তাহাও বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কলিকাতা শহরে ভদ্রলোকও বেশ্যার দালালি করে তাহা জানিতাম। কোনো কোনো পতিতা নারীর নিকটে আমি ভদ্রলোক দালাল রাখিবার পরামর্শ পাইয়াছিলাম, কিন্তু তখনও আমার বিবেক ও নীতিজ্ঞান একটু ছিল বলিয়া তাহা পারি নাই। আজ পাপপথের শেষ সীমায় আসিয়া হৃদয়ের অবশিষ্ট সদ্ভাবটুকুকে পদদলিত করিতে আমি আর ইতস্তত করিলাম না।

আমার উকিল ও ব্যারিস্টার দালাল দুইটি বেশ চতুর ও বুদ্ধিমান, দালালি-কার্যে তাহারা খুব পটু। দিনের পর দিন তাহারা আমার ঘরে বড় বড় লোক আনিতে লাগিল। কেহ

উচ্চশিক্ষিত জমিদার-পুত্র, কেহ রাজনীতিক নেতা, কেহ খ্যাতনামা চিকিৎসক, কেহ সমাজ সংস্কারক, কেহ ধনী-ব্যবসায়ী। ইহাদের মধ্যে প্রৌঢ় ও বৃদ্ধের সংখ্যই অধিক। বাংলাদেশের বাহিরের লোকও আসিতে লাগিল।

চার-পাঁচ মাসের মধ্যেই আমার হাতে কিছু টাকা জমিল। আমার দালালরাও প্রচুর অর্থ পাইল। আমি আমার মনের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, আমি কত ক্ষুদ্র, কত হীন হইয়াছি, নিত্য মিথ্যাচার, প্রতিদিন প্রতারণা, কেবল অর্থগৃধ্নুতা—ইহার ফলে আমার হৃদয় যেন শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যের মত হইয়া উঠিল। দর্পণে মুখ দেখিয়া বুঝিলাম আমার সে লাবণ্য নাই, সে কান্তি নাই, নরকের ঘৃণিত ছবি যেন ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। বয়োবৃদ্ধির অনুপাতে সোনাগাছিতে আবার আমার ঐ উকিল-ব্যারিস্টার বন্ধু আমাকে ত্যাগ করেন নাই। ইঁহাদিগের পরামর্শে আমি স্থানত্যাগপূর্বক ভবানীপুরে আসিয়া নূতনভাবে জীবিকা অর্জন আরম্ভ করিলাম। মনস্তত্ত্ববিদগণ জানেন এবং দীর্ঘকাল এই ঘৃণিত ব্যবসায় আমিও এ অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলাম যে জগতে যাহা সুলভ ও সহজপ্রাপ্য তাহা প্রকৃতপক্ষে সুন্দর হইলেও তত মোহজনক হয় না ; কিন্তু যাহা দুষ্প্রাপ্য ও সর্বাপেক্ষা দুর্লভ, তাহাই সমধিক প্রলোভনের বস্তু। আমি ভবানীপুরে একটা সুরম্য ভবনে মিস্ মুখার্জি নামে ব্যারিস্টার সাহেবটির শ্যালিকারূপে সাধারণের দুষ্প্রাপ্য হইয়া আসর জমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ফলও ফলিল। বাল্যে এবং কৈশোরে বিদ্যা অর্জন করিয়াছিলাম, পরে মানবসমাজের নানা স্তরের নানাপ্রকার জীবের সহিত অবাধ মিলনে মনুষ্যহৃদয়ের অতি গূঢ় তত্ত্বও সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম, সুতরাং মিস মুখার্জি-রূপে যখন সভ্য বন্ধুমহলে হাস্যরসিকতার অভিনয় করিতাম, যখন আপ-টু-ডেট্ সাজসজ্জার হাবভাববিলাসে বিগতপ্রায় যৌবনশ্রীর নূতন সংস্করণ লুব্ধ লোকচক্ষুর সম্মুখে ধরিতাম, যখন পার্কে হাত-ধরাধরি করিয়া ভগিনীপতি ব্যারিস্টারের সঙ্গে সান্ধ্যসমীরণ উপভোগ করিতাম, যখন একটি মাত্র কটাক্ষে অপরিচিতকে পরিচিতের পর্যায়ভুক্ত করিয়া বাটিতে আনিয়া স্বহস্তে পরিপাটিরূপে চা পান করাইয়া পরিতৃপ্ত করিতাম ও সঙ্গলিপ্সার দুর্দম্য বেগ তাঁহাদের হৃদয়ে সৃষ্টি করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিতাম, যেন আমার হৃদয়ের সে আবিল স্বার্থদুষ্ট রূপ কাহারও নয়নপথে পড়িত না, বরং ঊর্ণনাভের বিস্তৃত জালে তাঁহারা আবদ্ধ হইয়া আমার সহিত নিভৃত অলাপের অনুসন্ধান করিতেন। অবশ্য বলিতে হইবে আমিও কাহাকেও...। যাঁহার যখন উদয় হইত তিনিই যে আমার হৃদয়কমলের একমাত্র ভৃঙ্গ এবং অন্য সকলকেই মরীচিকা লইয়া ফিরিতে হইবে, তাহাকে বুঝাইয়া দিতাম।

কত সতীত্বের ভাণই করিয়াছি, আজ তাহা স্মরণ করিলেও হাস্য করিতে পারি না। একদিন সন্ধ্যার সময় সম্মুখে টিপয়ের একদিকে মিঃ গোস্বামী ও অপরদিকে প্রফেসার চৌধুরী। উভয়েই ধনী, উভয়েই সুপুরুষ। আমি হারমোনিয়মটি অঙ্গে স্থাপন করিয়া বেশভূষার পারিপাট্যের পরিবর্তে ইচ্ছাকৃত একটু অযত্নের ভাবে উন্মাদনা বৃদ্ধি করিয়া গান ধরিয়াছিলাম—

আজি অভিসার রজনী।
কোথা সে আমার কতদূরে তার দেখা পাব বল সজনি।
প্রেমের কমল ফুটেছিল তারই আলোকরেখার পরশে
দিন দিন করি বিতানু জীবন তাহারই পাবার হরষে।

মিঃ গোস্বামী বলিলেন, 'এখন বলুন তো কে সে এই ভাগ্যবান!' আমি বলিলাম, 'সে একটি মানসপুরুষ, একটি আদর্শ প্রণয়ী, বাস্তব জগতের কোনো প্রাণী না হইতেও পারে।' এমন সময় মিঃ চৌধুরী আমার পশ্চাৎদিকে অঙ্গুলিনির্দেশপূর্বক বলিলেন, 'ওই যে সে পুরুষপ্রবর, আপনি আসিয়াই ধরা দিল।' আমি ফিরিয়া চাহিতেই দুজনে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। আমি দেখিলাম আমার উকিলবাবুর সহিত আধুনিক সমাজের একটি নিতান্ত অচলবেশধারী অর্ধবয়স্ক মাণিক। আহা তাতে ছিল না কি? ঘড়ি, চেন, গন্ধতেল, আতর, চশমা, ছড়ি, শাল, ফুলমোজা, পানে-পানে ফাটা-ফাটা একজোড়া ঠোঁট, মুখের মত চলনবলন এবং যাহা কিছু অশোভনীয় তার সবই। তিনি আসিয়াই বলিলেন, 'আমরা বাহিরে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া আপনার অপ্সরা-কণ্ঠ শুনিতেছিলাম। এ রকম আর একবার শুনেছিলাম। ওঃ—বহু দিনের কথা, এই কলিকাতার রামবাগানের মতি বিবির বাড়ি। আমি পর্ববঙ্গের একজন পাট-ব্যবসায়ী। আমার পয়সা খায় নি এমন মেয়েমানুষ শহরে কম। কিন্তু আজ তোমার বাড়ি যা শুনলাম, জীবনে আর কোথাও তা শুনব না, তোমার কানাচ আর ছাড়ব না। এঁরা কারা!' এই কথা বলিয়াই তিনি একটি গিনি দিয়া আমাকে সম্মানিত করিলেন। তাঁদের ভাব দেখিয়া আমি একটা ঘৃণাসূচক ইংরাজি শব্দ উচ্চারণপূর্বক উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাঁকিলাম—'দারোয়ান—দারোয়ান—' দারোয়ান হাজির হইলে বলিলাম, 'ইস্‌কো নিকাল দেও।' পরে নিজেই সে কার্যের ভার লইয়া তাঁহাকে আমার সঙ্গে আসিতে ইঙ্গিত করিলাম এবং রাস্তার ধারে গেটের কাছে আনিয়া বিদায় দিলাম। বলিলাম, 'আমি তোমারই ; তবে সময় বুঝিয়া কথা কহিতে হয়। যাঁরা বসিয়াছিলেন তাঁরা আমাকে সহোদরার মত দেখেন।'

ক্রমশই রাত্রি অধিক হইতে লাগিল ; দুজনেই নাছোড়বান্দা। উভয়েরই ধৈর্যের সীমা নেই। মিঃ গোস্বামী পকেট হইতে হ্যামিল্টনের বাড়ির তাঁর সোনার সিগারেট-কেসটি টেবিলের উপর রাখিয়া দিলেন, আমি কেস হইতে সবগুলি [সিগারেট] বাহির করিয়া একটি কাগজের মোড়কে বন্ধ করিয়া কেসটি আলমারি-বন্ধ করিয়া বলিলাম, 'অন্তত ঐ মূল্যবান জিনিসটির অনুরোধেও আপনাকে প্রতি সন্ধ্যায় একবার মিস্ মুখার্জির শরণাগত হতে হবে ; কেবল যে দিন হতে মিস্ মুখার্জিতে আপনার স্নেহের অভাব দেখব সেইদিন এটা ফিরে পাবেন।' মিঃ গোস্বামী একটু বিহ্বলভাবে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'সেটা কি কখনও সম্ভব হবে? আপনাকে ভুলব?' মিঃ চৌধুরী হাসিয়া বলিলেন, 'তা হলে কেস্‌টি মহাশয়ের পকেটে প্রত্যাবর্তনও আর করল না দেখছি।' মিঃ গোস্বামীর তাঁর সিগারেট-কেসটির অবনতির জন্য অনুতপ্ত হইয়া একটু নীরব ভাব অবলম্বন করিতেই আমি একটা আঘাত

করিলাম, বলিলাম, 'কি রকম, বড় বাড়ির কথা ভাবছেন নাকি?' তিনি বললেন, 'সে আবার কি?' আমি বললাম, 'Lion's den-এ (সিংহের গহ্বরে) একটা beautiful cub-এর (সুন্দরী সিংহের বাচ্চা) শিকারে যাবেন ভাবছেন তো?' তিনি 'What a fiction !' বলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে মিঃ চৌধুরী বলিয়া উঠিলেন, 'But facts are more strange than fiction' (অর্থাৎ বাস্তবজগতের ঘটনাগুলি কল্পনারাজ্যের অদ্ভুত ব্যাপার অপেক্ষাও অধিকতর আশ্চর্যজনক হয়ে থাকে)।

মিস্টার গোস্বামীর অন্তর্ধানের সঙ্গে-সঙ্গেই আমার যেন একটু শিরঃপীড়া বোধ হইতে লাগিল। আর-একটি অসুখ, যাকে palpiation of the heart (যাকে হৃৎপিণ্ডের ধরফড়ানি বলে) রোগটি সময় বুঝে দেখা দিল। দুরাত্মার ছলের অভাব নাই, আমি বেশ একটু যেন কাতর হইয়া শোফায় অঙ্গ ঢালিয়া দিলাম ; আর, 'ওঃ—লাইটটা কি স্ট্রং' বলিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিতেই মিঃ চৌধুরী আলোকটি সুইচ অফ করিয়া দিলেন। তখন চাঁদের কিরণ ঘরে আসিয়া পড়িয়াছিল ; মিঃ চৌধুরী আমার নিকটে তাঁর চেয়ারখানি টানিয়া আনিতেই আমি তাঁর হাতটি টানিয়া আনিয়া বুকের উপর রাখিয়া বলিলাম—'আহা মিঃ চৌধুরী, আজ গোস্বামীকে কিরকম জব্দ করেছি বলুন ত। ৩০০ টাকার কেসটি যে হজম করলাম এটি অবশ্য বুঝতে বাকি নেই, আর ও কি আসবে বলেন।' তিনি যেমন একটা উত্তর দিতে যাইবেন, এমন সময় তাঁর হাতের আংটিটা খুলিয়া লইয়া বলিলাম, 'আপনাদের উভয়েরই আজ পরীক্ষা। ত্যাগের আঁচেই ভাই প্রণয়ের গাদ কাটে, বলিয়া গুণ গুণ করিয়া একটু সুর তুলিলাম :

ভালবাসার কষ্টিপাথরে
আজ তোমার কষব পরাণ...

এমন সময় ব্যারিস্টার-বন্ধুটি আসিয়া চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন, চাঁদের আলোয় দুটি প্রাণীর অস্তিত্ব অনুভব করিয়া, 'তা হলে Let me retire for the night' (তা হলে আজ রাত্রের মত বিশ্রাম লাভ করি) বলিয়া দরজাটি বাহির হইবার সময় টানিয়া দিয়া গেলেন। আমার এই দালাল বন্ধুদুটির নিজ নিজ ব্যবসায়ে পসার হয় নাই, সেই জন্য আমার এই কার্যে তাঁহারা সহায়তা করেন, দালালির অংশ আধাআধি।

কিন্তু আশা মিটে কই? অর্থেও সঙ্কুলান হয় না, বিশেষত এই মহাপাপের পয়সারও আবার দাবিদার দুইজন। একদিন ব্যারিস্টারকে বলিলাম, 'তুমি একবারে অকর্মা। এত জায়গায় জাল ফেললে একটিও রুই-কাতলা ধরতে পারলে না। রাজধানীর আশেপাশে জাল হাতে করে ঘুরলে হবে না, একটু দূরে যাও। যে বাঙালটি, সেই যে পাট ব্যবসায়ী গুহ, সেটি বেশ জবর মক্কেল ছিল, দর্শনেই এক গিনি, স্পর্শনে হয়ত পাটের সওদাগরি জাহাজও খানকতক এই গহ্বরে রেখে যেত। পারবে ধরতে তাকে।'

কিছুদিনের জন্য ব্যারিস্টার দালাল উধাও হইলেন। শেষে একটি প্রকাণ্ড কাণ্ড করিয়া বসিলেন। আসাম হইতে বেশ একটি ভদ্রবেশধারী ধনবান মনুষ্য গ্রেপ্তার করিয়া আনিলেন।

তিনি চিরকুমার, ব্রত প্রচারের জন্য তাঁহার উৎসাহের অভাব নাই। তিনি প্রথম দিনেই আমাদিগের আতিথ্য স্বীকার করিয়া রজনীযোগে চিরকৌমার্যের মহিমা কীর্তন শুরু করিয়া দিলেন। আমি কপটাচারে অভ্যস্ত। গভীর রাত্রে তাঁহার সঙ্গে একাকী এ বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব বলিয়া রাত্রির জলযোগ শেষ করিয়া লইলাম।

মধ্যরাত্রে আলো জ্বালিয়া, ফ্যান খুলিয়া দিয়া, যুবক-যুবতীর পরস্পরের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণকে লক্ষ করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে কঠোর অশুভ মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলাম। বলিলাম, 'ঈশ্বরের এই পবিত্র রাজ্যে মানুষ নানাবিধ কৃত্রিম উপায়ে পাপপথে সর্বদা নরনারীকে আকর্ষণ করিতেছে।' উদাহরণ স্বরূপ তাঁহাকে একটি প্যাকেট হইতে কতকগুলি প্যারিসের ছবি খুলিয়া এক-একটি দেখাইতে লগিলাম। যে পাকা শিকারী সে কখনও চিড়িয়ার প্রাণ বধ করে না। সিংহ, ব্যাঘ্র—প্রভৃতি জবরদস্ত হিংস্র জন্তুই তাহাদের শিকারের বস্তু।

যখন ছবিগুলি দেখাইয়া, তাহার মধ্যে কোন্ অংশ কিরূপ অশ্লীল, বিশেষভাবে তাহার বিচার করিতে লাগিলাম, দেখিলাম যেন তাঁহার আস্ফালন অনেকটা মন্দীভূত হইয়াছে, তিনি আগ্রহ সহকারে সেগুলি যেন দুই চোখ দিয়া গিলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাহার পর বলিলাম, 'নরনারীর বিবাহে বা প্রণয়-মিলনে এই সব ঘৃণিত কার্যই সম্পাদিত হয়। আপনি যদি চিরকুমারব্রত ধারণ করিয়া জীবনযাপন করিতে পারেন আমিও আপনার সহিত চিরকুমারীরূপে এই মহান ধর্ম প্রচারে সহায়তা করিব।' তিনি বলিলেন, 'এরূপ ছবি আরও আছে?' আমি তখন একটি বাক্স আনিয়া তাঁহার নিকট হাজির করিলাম ; তিনি উৎসাহ সহকারে আমার নিকট এমনভাবে ঘেঁসিয়া বসিলেন যে কপট চিরকুমারী আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য চেয়ারটি সরাইয়া লইলাম। তিনি বলিলেন, 'আপনি কিজন্যে এতগুলি ছবি সংগ্রহ করিয়াছেন?' আমি বলিলাম, 'পাপ হইতে দূরেতে থাকিতে হইলে পাপের স্বরূপ পূর্বে চিনিয়া লওয়া প্রয়োজন, তাই এইগুলি যত্ন করিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু কি আশ্চর্য যখন নিভৃতে এইগুলি সম্মুখে রাখিয়া মনে মনে ইহাদের কুৎসিত ভাবগুলি আলোচনা করি, তখন কি একটা ঘৃণিত লিপ্সা প্রাণে জাগিয়া উঠে। যেন, ছি ছি সে কথা বলিতে লজ্জা মনে হয়। আপনি চিরকুমারব্রতধারী, বলিতে লজ্জা করে, তখন মনে হয়—বোধ হয় অতি নিকট-আত্মীয় বিরুদ্ধ সম্পর্কীয় একজন সুবেশধারী যুবকের সঙ্গও আমার পক্ষে নিরাপদ নহে।

ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া তিনটে বাজিল। আমি বিশ্রামের প্রস্তাব করিলাম। তিনি সম্মত হইলে, উভয়ে একই কক্ষে শয়ন করিলাম, আমি নিদ্রার ভাণ করিয়া নীরব রহিলাম, কিন্তু জাগ্রত ছিলাম, তিনিও নিদ্রা যাইতে পারিলেন না। আমি পূর্বেই পরিচয় পাইয়াছিলাম, তিনি মহাধনী। এক্ষণে সাড়া দিয়া বলিলাম, 'এই বাড়িখানি আমি ভাড়া লইয়াছি, বিশ হাজার টাকা হইলে এখানি নিজস্ব করিয়া, এইখানে দুজনে থাকিয়া এই মহামন্ত্রের প্রচার করিতে সমর্থ হই, নচেৎ শীঘ্রই এ স্থান ত্যাগ করিতে হইবে। তিন মাসের বাড়িভাড়া ১০০

টাকা হিসাবে বাকি পড়িয়াছে।' তিনি তৎক্ষণাৎ স্বীকার হইলেন। বলিলেন, 'যদি আপনার মত সঙ্গী পাই তবে যথাসর্বস্ব এই কার্যে ব্যয় করিতে প্রস্তুত আছি। বুঝিলাম হস্তগত করিয়াছি। তখনও তাঁহার নিদ্রা আসে নাই, আসিবার সম্ভাবনাও ছিল না, তখন আমার পবিত্রব্রতধারী, আমার জীবনসঙ্গীর একটু পরিচর্যায় নিযুক্ত হইলাম। নিকটে আসিয়া বলিলাম, 'নূতন স্থানে আসিয়া আপনার নিদ্রার ব্যাঘাত হইতেছে, একটু তোয়াজ করিলেই সুস্থ হইতে পারিবেন।' আমার আর তখন ভয় কি? তিনিও পবিত্র আমিও পবিত্র। তাঁহার মস্তক নিজ অঙ্কে স্থাপন করিয়া কেশগুলির মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে লাগিলাম। বলিলাম, 'যুবক ও যুবতীর মনের দৃঢ়ভাবও, পরীক্ষা হওয়া আবশ্যক। প্যারিস-ছবিগুলির একটি ছবির প্রসঙ্গ তুলিয়া তাঁহার মানসপটেও ভাবটি চিত্রিত করিয়া দিলাম, তিনি তৎক্ষণাৎ পার্শ্ব পরিবর্তন করিলেন, আমি তাঁহার শোচনীয় অবস্থা অনুভব করিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিলাম। আমরা পিশাচী, পৈশাচিক আনন্দই আমাদের আনন্দ। তাঁহাকে এই পর্যন্ত পাপের পথে আগাইয়া দিয়া, তাঁহারই অনতিদূরে শয্যা রচনা করিয়া শয়ন করিলাম।

পরদিন প্রভাতে কি দেখিলাম। একদিন পূর্বে যিনি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন, যিনি কখনও কাহারও পাণিপীড়ন করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন, তিনিই এক রাত্রির মধ্যে আমার পরম ভক্ত, অনুগত দাসে পরিণত হইয়াছেন। যে নারী সর্পদষ্ট অঙ্গুলির ন্যায় তাঁহার পরিত্যাজ্য সেই নারীশিরোমণি আমি বারবিলাসিনী মানী, ওরফে মিস্ মুখার্জি ভিন্ন তাঁর অন্ন রোচে না। চা আসিল, বিস্কুট আসিল, নিষিদ্ধ পক্ষীর একজোড়া ডিম আসিল, কিন্তু তাঁহার মুগ্ধ নেত্র আমায় অনুসরণ করিতে লাগিল। আমি যাইয়া চা পানে রত হইলাম, তখন তিনি শীতল চা-টুকু ঢোকে ঢোকে গিলিতে লাগিলেন।

বাড়ি ক্রয় করিবার জন্য দুই-তিন মাসের মধ্যে বিশ হাজার টাকা আমার হস্তগত হইল। আমার অঙ্গ মণিকাঞ্চনাদি নানা অলঙ্কারে ভূষিত হইল। অলঙ্কারে আমি আপত্তি করিলেও তাহা গ্রাহ্য হইল না। আমি একদিন তাঁহাকে বলিলাম, আমিই চিরকুমারী থাকিয়া ব্রত উদ্‌যাপন করিব, তিনি অনয়াসে সংসার আশ্রমে প্রবেশ করিতে পারেন। তিনি বলিলেন, আশ্রমের সেরূপ ওলটপালট করিতে আমাকে নাকি তাঁহার সঙ্গে যোগ দিতে হইবে। আমি তৎক্ষণাৎ দুই কর্ণে দুই হস্তের দুটি অঙ্গুলি প্রদান করিতেই অসাবধানতাবশত তাঁহার সম্মুখে বে-আব্রু হইয়া পড়িলাম, তিনি উন্মত্তের মত আসিয়া আমাকে গভীর আলিঙ্গনে নিষ্পীড়িত করিয়া গণ্ডদেশে এক-নিশ্বাসব্যাপী চুম্বন করিয়া দিলেন।

তারপরই একদিন সরাসরি বিবাহের প্রস্তাব। আমি বলিলাম, 'এর কর্তা আমি নই, দাদাবাবু।' দাদাবাবু আসামীর সঙ্গে বাঙালি শিক্ষিতা যুবতীর এরূপ মিলন অসম্ভব বলায়, আমার গবুচন্দ্র প্রণয়ীটি কিল খাইয়া কিল চুরি করিয়া অদৃশ্য হইলেন।

কুমাব গোপিকাবমণ রায় উল্লিখিত জমিদার যুবকেব নাকি বিশেষ বন্ধু, কুমার বাহাদুরের আলয়ে আমার হতাশ প্রণয়ী নিমন্ত্রিত হইতেন শুনিয়াছি। কতদিন ইনি কুমার বাহাদুবের গৃহে আমাকেও লইযা যাইতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু আমি সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই। তবে কুমার বাহাদুরকে একদিনের জন্য আমার প্রণয়ীর মারফত আমার কুটিরে পদধূলি প্রদানের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু জানি না কি অপরাধে তিনি আমাকে কৃতার্থ করেন নাই। ওই সময় আমি বেশ্যা বলিয়া পরিচিতা ছিলাম না। আমার এই বিচিত্র জীবনের আখ্যায়িকার কত কথাই লিখিলাম। মানুষ প্রবৃত্তির তাড়নায় কত ঘৃণিত কার্য করিতে পারে তাহাও দেখাইলাম। যাহা পবিত্র, মানুষ তাহাকে কলুষিত করিতে বিশেষভাবে চেষ্টিত। যে মুখখানি আবরণহীন, লোকে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করে না, যাহা আবৃত, যাহা পাপস্পর্শে মলিন হইয়া যায়, লোক তাহাতেই আকৃষ্ট। যে নারী প্রকাশ্যভাবে পুরুষের সঙ্গ কামনা করে, পুরুষ তাহাকে চায় না। অথচ যে কুলমহিলা পাপস্পর্শে সদা ভীত, পাপাত্মাগণ তাহাকেই পাপপঙ্কে নিমজ্জিত করিতে চায়! হায়, আমার চিরকুমারব্রতধারীর কি পরিণতি ঘটিল! কোথায় সেই ব্রত! কোথায় তার উদ্‌যাপন! এত অল্পদিনে নারী স্পর্শেই তাঁর দৃঢ় হৃদয় চূর্ণ হইয়া গেল, সংকল্প বিকল্পে পরিণত হইল। তিনি ধন-মান-যশ হারাইয়াছেন, এত অল্পদিনেই আমার চরণে দাসখত লিখিয়া দিয়া ধন্য হইলেন। আমি কাহাকেও ক্ষমা করি নাই। সুন্দর রাজঅট্টালিকাবাসী ধনী মাড়োয়ারি মহলেও আমার বিশেষ কদর ছিল। তাহাদের কতক অর্থও আমার হস্তগত হইয়াছে। আমার উকিল দালাল একজন বিশিষ্ট মাড়োয়ারিকে আনিয়াছিলেন। সে আমাকে দেখিবামাত্র বলিল, বিবি সাহেব, স্বজাতীয় নাদাপেটি মাড়োয়ারি নারীতে কোথাও শোভা নাই। বিদেশীয় আস্বাদেই পরম তৃপ্তি। সে আমাকে সোহাগ করিতে বলিত। আমি তাহাকে 'প্রাণেশ্বর' বলিয়া একটি করিয়া গিনি সংগ্রহ করিয়াছি। একটি চুম্বনের মূল্যস্বরূপ দুটি গিনিও হস্তগত করিয়াছি। একদিন বাগানবাড়িতে যাইয়া আমি ৩০০ টাকা আদায় করিয়াছিলাম। যাহারা হিন্দুধর্মের এমন ধ্বজা উড়ায় তাহারা যে এমন কামান্ধ, পরদারপরায়ণ, তাহা আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল।

একাদশ

টি-পার্টি

ভবানীপুরে উঠিয়া আসিয়াছি তার পর হইতে আমি মিস্ মুখার্জি নামেই পরিচিতা। আমি এখন আর 'মানদা' 'ফিরোজা বিবি' বা 'মানী দিদি' নহি। প্রতিদিন আমি নূতন নূতন মতলব আঁটিতে লাগিলাম। আমার এই মতলবের মধ্যে টি-পার্টি ছিল প্রধান। আফিস ছুটির পর আমার দালাল আসিতেন। যাঁহারা আসিতেন তাঁহারা ভাল-মন্দ উভয় শ্রেণিরই ছিলেন। দুই-এক ঘণ্টা আলাপ-পরিচয়েই আমার প্রয়োজনীয় ব্যক্তিটিকে বাছিয়া লইতে

পারিতাম। এভাবে যাঁহারা আসিতেন তাঁহাদের দ্বারা আমার তেমন ভাল আয় হইত না, বিশেষত এদের জন্যও খরচ হইত। বড়লোকের পকেটে হাত দিতে না পারিলে আমার ও দালালদ্বয়ের কি করিয়া পোষাইবে।

একদিন ব্যারিস্টার সাহেবকে বলিলাম, 'দেখ, একটা কাজ কর, এই কলিকাতা শহরের বড় ব্যবসায়ী, বড় চাকুরে, ডেপুটি, মুন্সেফ, জমিদার, উকিল, ব্যারিস্টার, স্কুলের শিক্ষক, প্রফেসার, দেশকর্মী, সংস্কারক—এদের মধ্যে যাহাদের পকেটে বেশ টাকা আছে তাদের প্রত্যেক শ্রেণি হইতে পাঁচজন করে নিমন্ত্রণ করে একটা ভাল পার্টির বন্দোবস্ত কর দেখি!'

ব্যারিস্টার সাহেব দিন-চারেকের মধ্যে একটা লিস্ট করিয়া আমাকে দেখাইলেন, লিস্ট-মধ্যে পূর্বজীবনের পরিচিত তিনটি ভদ্রলোকের নাম আমি ছাঁটিয়া দিলাম। তিনি নূতন নাম দ্বারা তাহা পূরণ করিলেন। এক রবিবারে এই পার্টির আয়োজন হইল। আমার নামে ছাপানো নিমন্ত্রণ-কার্ড দারোয়ান দ্বারা পাঠানো হইল। স্কুলের শিক্ষক এই নিমন্ত্রণে একজনও আসেন নাই, মুন্সেফ মাত্র একজন আসিয়াছিলেন, তিনি পার্টি শেষ হইবার পূর্বেই চলিয়া যান। দেশকর্মী এবং উকিল ও ব্যারিস্টার প্রায় সকলেই আসিয়াছিলেন। অন্যান্যদের মধ্যেও প্রায় অনেকেই আসিয়াছিলেন। জলযোগের সামান্য বন্দোবস্ত ছিল, আর ছিল বিলাতী তরল পদার্থ। অবশ্য এ জিনিসটা সকলের মধ্যে পরিবেশিত হয় নাই। এই উপলক্ষে একটা ব্রহ্মসঙ্গীত এবং রবীন্দ্রনাথের চারিটি গান আমি গাহিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত প্রদীপকুমার রায়ও কয়েকটি গান গাহিয়াছিলেন। একজন দেশকর্মী একটা স্বদেশসংগীত গাহিতে আমায় অনুরোধ করিলেন। আমি এই নূতন গানটি গাহিয়াছিলাম।

হাত দিয়ে তুই বাঁধলি হাত
প্রাণ দিয়ে প্রাণ বাঁধলি না ;
এ যে সোনা ফেলে দিলি গেরো
আঁচলে, তা বুঝলি না।
তিরিশ কোটি বন্ধু পেলে,
জগত জয় অবহেলে
করতিস, তা আর পারলি না।

গান শেষ হইলে রাজনৈতিক তর্কবিতর্ক আরম্ভ হইল ; একজন কর্মী পদ্ম সরকারের[৩৮] নিন্দা আরম্ভ করিলেন—তার নাকি কোথায় দুই-একটা রক্ষিতা আছে, তাহার কথা, তাহার জালজুয়াচুরির কথা তুলিয়া তাহাকে অত্যন্ত হেয় প্রতিপন্ন করিলেন। মিঃ ঘোষ ইহার প্রতিবাদ করিলে, অন্য এক দেশকর্মী মিঃ ঘোষকে পর্যন্ত আক্রমণ করিতে ছাড়িলেন না। তিনি ইহাও বলিতে একটু ইতস্তত করিলেন না যে, দেশবন্ধু এদের লাই দিয়ে বড় করে

বড়ই ভুল করেছিলেন। দেশবন্ধু ভুল করিয়াছিলেন—এ কথাটাতে আমার প্রাণে যেন কেমন লাগিল, তখন আমিই ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম, দেশবন্ধু ভুল করিয়াছিলেন কি ঠিক করিয়াছিলেন, তাহা তোমার-আমার মত লোকের বুঝিবার শক্তি নাই, সে অগাধ সমুদ্রের তলস্পর্শ তোমার-আমার মত লোকের কাজ নয়। তিনি কাহারও উপর কোনো কার্য বিশেষের জন্য বিদ্বেষ বা প্রতিহিংসা পোষণ করিতেন না। তিনি লোক চিনিতে পারিতেন বলিয়াই এমন লোক ও স্থান দিয়াছিলেন। যেমন কুস্তিগির পালোয়ানের প্রয়োজন, তেমনি এই লোক দ্বারাও তিনি তার উপযুক্ত কাজ করাইবার জন্যই রাখিয়াছেন।

এর পরও তিনি জের ছাড়িলেন না, বলিলেন, 'এ যে বিশ্বাসঘাতক'—সেই প্রমাণ বোধ হয় দেশবন্ধু পান নাই। এখন তার মূর্তি বাহির হইয়া গিয়াছে—মহারাজা ক্ষৌণিশের কাছে গোপনে দলের খবর এ লোকটাই দিত...তারাদিদির প্রণয়ীর এ অপমানটাতে আমার মনটা যেন কেমন হইয়া গেল, প্রকাশ্যে বলিলাম আপনারা শ্লীলতার বাহিরে যান কেন? বিশেষত পদ্মবাবুর অসাক্ষাতে বলা কি ভাল! তার কথা না জানে কে, তাকে তো লোকে ওই চক্ষুতেই দেখে। আজ যে পার্টিতে তাকে বলি নাই, কারণ, তাকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে জানিলে হয়ত অনেক বিশিষ্ট লোকও নাও আসিতে পারেন।'

এই ভদ্রলোকটি আবার বলিতে লাগিলেন, 'বীরেন শাসমল[৩৯], জিতেন ব্যানার্জি[৪০] এবং হেমন্ত সরকার[৪১] কেন চলিয়া গিয়াছেন, তাহা কি আপনারা জানেন?' আমি তাঁকে আর বাড়িতে না দিয়া কোনোপ্রকারে থামাইয়া রাখিলাম।

মিঃ ঘোষ, ব্যারিস্টার সাহেবের সঙ্গে অন্য ঘরে যাইয়া একটু টনিক খাইয়া আবার আসিলেন। তিনি বলিলেন, 'মিস্ মুখার্জি, কিছু মনে করিবেন না। সেদিন ঢাকার কাগজে দেখা গেল কোনো মেয়ে-বোর্ডিং-এ আবর্জনার স্তূপে এক মৃত ভ্রূণ পাওয়া গিয়াছে। ইহা লইয়া ঢাকায় মহা হুলস্থূল। আজকাল যে-প্রকার অবাধ মেলামেশা চলিতেছে, ইহারই ফলে এ ভ্রূণহত্যা নহে কি?' ঢাকার এক ভদ্রলোক বলিলেন, 'একটা নহে, অনেক।'

আমি বলিলাম, 'অবাধ মেলামেশা দোষের নহে, নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে হয়। এই যে মেয়েগুলি আজকাল ছেলেদের সঙ্গে এক কলেজে পড়ছে—দেখুন তাদের কেমন সুন্দর চাল-চলতি, যেন ঠিক ভাই-বোন। প্রকৃতির যা নিয়ম—ভাই-বোন এক সঙ্গে—এরা ঠিক তাই...'। আমি শিক্ষিতা উদার মিস্ মুখার্জি, ইচ্ছার বিরুদ্ধেও আমাকে অবাধ মেলামেশা সমর্থন করিতে হইল। নইলে আমার মান থাকে কোথায়। অবাধ মেলামেশার জন্যই আজ আমি পতিতা।

মিঃ ঘোষ তখন বলিলেন, 'আপনি কি বলিতে চান যে ওই সব কলেজের ছেলেগুলি সব ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির! পূর্ণাঙ্গী মহিলাদের কাছে সমস্ত দিন ঘুরে-ফিরেও এদের কোনো

ভাবান্তর উপস্থিত হয় না?' আমি বলিলাম, 'সকলের কি আর এক রকম হতে পারে? উহাতে কাহারও যদি ভাবান্তর হয়—এবং যদি একটু -কিছু হয়ই—তবুও তেমন দোষ কি? স্বাধীন দেশে ত এমন কত হচ্ছে, তাতে কি আসে যায়!'

মিঃ ঘোষ তখন বলিলেন, 'তবে কি আপনি এ দেশটাকে ইংলণ্ড ও আমেরিকার ন্যায় দেখতে চান?' ইহার উত্তর কি দিব তাহা ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না। এমন সময় মিঃ ঘোষ আবার বলিলেন, 'রুচিবাগীশ হেরম্ববাবু' নাকি 'থিয়েটারের বাড়ি দেখাইয়া দেওয়া'ও পাপ মনে করেন, কারণ উহাতে যে সকল স্ত্রী-পুরুষ যাইয়া থাকে তাহাদের নাকি মনোবৃত্তি ভাল নহে। আজ তাঁর কলেজে যে সকল যুবক-যুবতী এক সঙ্গে পড়ে তাদের মনোবৃত্তি কেমন তাহা যদি তিনি 'ব্যালটে' পরীক্ষা করেন তবেই বুঝিতে পারিবেন। হেরম্ববাবু কি অবাধ মেলামেশার ফলে ঢাকার দুইটি ব্রাহ্ম পরিবারের বিবাহের ফল এবং তজ্জন্য এক পরিবারের পুনরায় হিন্দুধর্ম গ্রহণের বিষয় অবগত নহেন? রমলা গুপ্তা, লীলাবতী প্রভৃতি মোকদ্দমার বিষয় কি তিনি শুনেন নাই? রমলা গুপ্ত ত তাঁহাদেরই সমাজের লোক।'

এ বিষয়ে, আমি আর বাড়াবাড়ি পছন্দ করিতেছিলাম না, বিশেষত রাত্রি অধিক হইয়াছিল। ক্রমে অনেকেই বিদায় গ্রহণ করিলেন, একটি খদ্দর পরিহিত যুবক রহিয়া গেলেন। ইনি এখন কৌমার্যব্রত পালন করিতেছেন, এরও বাজারে যথেষ্ট সুনাম আছে। ভাবিলাম, এদের মত কুমার আমার কুমারীর সংখ্যা যদি এমনভাবে বৃদ্ধি হয় তবে এ দেশের কি শোচনীয় পরিণাম।

গার্ডেন পার্টি

আমি নিজে পতিতা, তার উপর আবার সাজিয়াছি ভদ্রঘরের কুমারী, এইপ্রকার জুয়াচুরি আর ভাল লগিতেছে না। আমার হাতে হাজারকয়েক টাকা জমিয়াছে। এ হীন পাপবৃত্তি আর করিব না কল্পনা করিতেছিলাম, কিন্তু আমার দালাল দুইজন অসুখী হন দেখিয়া অনেকটা ইচ্ছার বিরুদ্ধে লিপ্ত আছি।

দেহবিক্রয় করিবার জন্য বার বার আমায় প্রলুব্ধ করিয়াছিল রানিমাসি, সেজন্য তাকে ততটা দোষ দেওয়া হয়ত চলে না, কারণ উহাই ছিল তাহার ব্যবসায়। কিন্তু আমার এই দালালদ্বয়, যাহারা ভদ্রলোকের ছেলে বলিয়া পরিচিত এবং উচ্চশিক্ষার ডিগ্রিও যাদের আছে, তাদের এই প্রকার প্রবৃত্তির বিষয় যখন ভাবিতাম, তখন মনে হইত, হায়, এ জগতের কি কল্যাণ আছে! যে জাতির মধ্যে উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোকের ছেলে বেশ্যার দালালি করে—দালালি করে কেন, বেশ্যাকে বেশ্যাবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে দেখিলে তাহাকে ঐ পাপবৃত্তি করিতে প্রলুব্ধ করে, তাহারাও ভদ্র এবং শিক্ষিত। আমি দেখিয়াছি, বারবনিতা সমাজেও কেহ এই বৃত্তি পরিত্যাগ করিতে চাহিলে, অনেক পতিতা তাহাকে সাহায্যই করিয়া থাকে, কিন্তু ভদ্রনামধারী লোকের এ কি প্রবৃত্তি। সেদিন রামবাগানের অবস্থাপন্ন

পতিতা-নারী চুনি গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে , তাহার আত্মহত্যার কারণ সে এক চিঠিতে লিখিয়া গিয়াছিল—'পতিতার জীবনে আমার ধিক্কার জন্মিয়াছে।' সে অন্যান্য পতিতাকেও এই বৃত্তি পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছে। যে পাপবৃত্তি করিতে প্রাণ চাহে না, তাহাতে লিপ্ত থাকিতে যে কি কষ্ট, তাহা কাহাকেও বুঝানো যায় না। একদিন আমার উকিল দালালটি বলিলেন, 'দমদমায়...বাবুর বাগানে একটা পার্টি দিব ঠিক করিয়াছি।' আমি বলিলাম, 'দমদমায় আর কেন, যদি দিতেই হয় তবে বাড়িতেই দাও।' তিনি শুনিলেন না, বাগানেই ভাল লোক আসেন, ইহাই বুঝিয়া পার্টির উদ্যোগ করিলেন। আমার নামে মুদ্রিত নিমন্ত্রণপত্রও বিলি হইল, কিন্তু কাহারা যে নিমন্ত্রিত হইলেন সে খবর আমি নেই নাই। অনিচ্ছায় যে কাজ, তাহাতে তেমন উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকে না। নির্দিষ্ট দিনে আমার নিজের মোটরে দমদমায় গেলাম। মোটর চালাইতেন খোদ ব্যারিস্টার সাহেব। আমি তাঁর বাম দিকে বসিয়াছিলাম, উকিল বাবু ছিলেন আমাদের পিছনে।

দমদমায় যাইয়া দেখি সেখানে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ২০/২৫ জন লোক বসিয়া আছে। কয়েকটি খদ্দর পরিহিত যুবক নানা আয়োজনে ব্যস্ত। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এরা কারা!' উকিলবাবু বলিলেন, 'যিনি পার্টির খরচ দিচ্ছেন...বাবু, এরা তাঁহারই লোক। যিনি খরচ বহন করিতেছেন তাঁহারও খদ্দরের জামা-কাপড় এবং পায়ে স্যাণ্ডেল দেখিয়া মনে মনে বড় বিরক্ত হইলাম। কারণ নিন্দিত পল্লীতে থাকিতেও এইপ্রকার খদ্দর পরিহিত বহু যুবক, প্রৌঢ়ের সাক্ষাৎ ঘটিয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা আয় হইয়াছে সামান্য। পুলিশ যেমন ওই সকল পল্লীতে তাহাদের দাপটে কাজ সারিয়া যায়, খদ্দর পরিহিত দেশকর্মী ভলাণ্টিয়ার নামধারী অনেক যুবকও বলে—আমরা দেশের কাজে ব্রতী, পয়সা পাব কোথায়? অনেক কবি এবং সাহিত্যিকের দলও রিয়েলিস্টিক আর্টের খোঁজে নিন্দিত পল্লীতে যাইয়া মার্জিত কথা বলে এবং বিনা খরচায় আর্টের স্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা করে, সুতরাং আমার বিরক্ত হওয়াটা যে খুব অন্যায় হইয়াছে তাহা অন্তত কোনো ব্যবসায়ী লোক মনে করিবেন না।

সেদিন শিষ্টতার খাতিরে একটা গান গাহিলাম। আমার পরে অন্য দুই-একজনও গান ধরিলেন। গান শেষ হইলে নারীনিগ্রহের কথা উঠিল, সকলেই ইহার জন্য তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। মন্তব্য প্রকাশের প্রধান কারণ মুসলমান সমাজের নীরবতা। একজন মুসলমান ভদ্রলোক ইহার প্রতিবাদ করিয়া যাহা বলিলেন, তাহার সারমর্ম এই—হিন্দু নারীগণই মুসলমানদের সঙ্গে যায়, ইহা মুসলমানদের দোষ নহে। মৌলবী আক্রাম খাঁও[৪২] এই প্রকার কথাই তাঁহাদের আহূত প্রতিবাদ সভায় বলিয়াছিলেন। এই পার্টি যেদিন হইয়াছিল তাহার কয়েকদিন পূর্বের কাগজেই ময়মনসিংহ শহরের ওভারসিয়ার শিক্ষিত মুসলমান আব্দুল রহিমের অবিবাহিতা কন্যা এবং কটিহাদি থানার গোলাম সাহেবের স্ত্রীর নির্যাতনের খবর দেখাইয়া বলিলাম, ইহারা কি হিন্দু ছিল? না, হিন্দু ইহাদের অপহরণ করিয়াছে! আক্রাম খাঁ সাহেবকে একটু ভাবিয়া ইহার উত্তর দিতে বলিবেন কি? আবদুল

রহিম সাহেবের এই কন্যাকে উদ্ধার করিবার জন্য হিন্দুগণ যে প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন তেমন প্রাণপণ চেষ্টা মুসলমানগণও করেন নাই। থানার দারোগা ঘোষাল মহাশয়ও হিন্দু, তিনি এজন্য আসমুদ্র-হিমাচল মন্থনের আয়োজন করিয়াছিলেন। মৌলবী সাহেব এ বিষয়ে আর কোনো জবাব দিতে না পারিয়া সৈনিক-কবি নজরুল ইসলামের বিবাহটা উল্লেখ করিয়া ফেলিলেন[৪৩] এবং হিন্দুর দোষেই এ বিবাহটা হইয়াছে বলিলেন। তিনি আরও বলিলেন, 'নজরুল কি মেয়ের ভাইয়ের নিকট এ প্রস্তাব নিয়া প্রথমে যাইতে সাহসী হইত যদি সে'... আমি তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলাম, 'যাহাদের কোনো শাস্ত্রানুসারে বিবাহ হইয়াছে, তাহাদের কথা উল্লেখ করা উচিত নয়, আপনি এ বিষয়ে কোনো কথা বলিবেন না।' তিনি বেশ একটু রাগের ভাব দেখাইয়া চুপ করিতে বাধ্য হইলেন। আমি মনে মনে বলিলাম, ইহা একমাত্র অবাধ মেলামেশার পরিণাম, যদি বিবাহটা আরও কিছু দিন টিকিয়া যায় তবে হয়ত বা পাকা হইলেও হইতে পারে।

এই মৌলবী সাহেবটি এমনই নির্লজ্জ যে আবার বলিতে লাগিলেন, আজকাল রাস্তাঘাটে যে সকল হিন্দু মেয়ে বে-আবরু চলা-ফেরা করেন, তাঁদের অনেকের ডানদিকের অঙ্গবিশেষের উপর ইচ্ছাপূর্বক শাড়ি না দিবার কারণ কি? আমি লজ্জায় জিভ কাটিলাম। এ কথার কি উত্তর দিব? পতিতাগণও যে-অঙ্গ রাস্তায় চলিতে সাবধানে ঢাকিয়া চলে, আজকাল গৃহস্থ কুমারী ও বিবাহিতাদিগের অনেকে উহা খোলা রাখা যেন ফ্যাশান্ মনে করেন। ইহার উত্তর নাই। বেশ একটু রুক্ষ মেজাজে তাঁহাকে বলিলাম, 'মহিলাদের সম্মান রাখিয়া যিনি কথা বলিতে পারেন না, তাঁহার কথা না বলাই উচিত।'

আমার এই কথায় কয়েকজন বিশিষ্ট মুসলামান এক সঙ্গে চলিয়া গেলেন, কিন্তু রহিলেন দুই-এক জন। যিনি পার্টিদাতার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং হিন্দু-মুসলমান মিলনের বিশেষ কর্মী বলিয়া আমার দালাল আমাকে তাঁহার নিকট পরিচয় করাইয়া দেন, তাঁহার মতলব আমার আর বুঝিতে বাকি রহিল না। আমি আমার দালালকে ঘৃণাভরে গোপনে বলিলাম : 'এ পাপবৃত্তি আজই শেষ, আর না। নিন্দিত পল্লীতেও যাহাদের গ্রহণ করি নাই আজ তুমি তাদের নিয়ে এসে হাজির। ধিক্ তোমাদের শিক্ষায়।' দালালটি বলিল, এ না হলে যে হিন্দু-মুসলমান মিলন হয় না, তাই এদের বাদ দিয়ে পার্টি দেওয়া ভাল নহে। তাহাদের প্রকাশ্যে কিছু বলিলাম না, লোকটার রুচি যেন মার্জিত বলিয়াই মনে হইল।

এমন সময় কেহ সর্দার বিলের[৪৪] বাদ-প্রতিবাদ আরম্ভ করিলেন। আমার আর উহাতে যোগ দিবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু গায়ে পড়ে যখন আমার মতামত জানিতে চাহিল তখন আর কি করি। আমি যে শিক্ষিতা উদার নারীর আবরণে নিজেকে ঢাকিয়া কথা কহিতেছিলাম, তাহা ভুলিয়া গেলাম। আমাদের পতিতা সমাজে যে হাজার হাজার কুমারী মেয়ে প্রথম যৌবন উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে যৌনলিপ্সা চরিতার্থ করিতে না পারিয়া প্রবৃত্তির তাড়নায় হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া অবৈধ প্রেমে মজিয়া নিন্দিত পল্লীতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছে—তাহাদের কথাই মনে হইল ; মনে হইল যাহারা নিজেদের কলঙ্ক ঢাকিয়া

রাখিতে পারে নাই তাহারাই যে এখানে আসিয়াছে, তাহারা তো সমাজের অতি সামান্য অংশ নহে। এ প্রকার গুপ্তপ্রেম কয়টা ধরা পড়ে? হাজারে দু-একটা বই তো নয়।

প্রকাশ্যে বলিলাম, 'প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে চতুর্দশের সঙ্গে সঙ্গেই যখন মেয়েদের প্রবৃত্তি জাগরিত হয়, তখন উহার পূর্বেই বিবাহ দেওয়া উচিত।' মৌলবী সাহেব বলিলেন, 'মিস্ মুখার্জির মুখে এমন উত্তরের আশা করি নাই।' আমি বলিলাম, 'আমি কেন, ঐ সেদিন যে নারীবাহিনী সর্দার বিল সমর্থন করিতে টাউন হলে গিয়েছিল, তাহাদের যাইয়া গোপনে জিজ্ঞাসা করুন, তাহারাও আমার মতেরই প্রতিধ্বনি করিবে।' আমি আর নিজেকে সামলাইতে পারিলাম না—ঢাকার ছাত্রীনিবাসের ভ্রূণহত্যা, দাস-গুহ পরিবারের অবৈধ বিবাহ—প্রভৃতি কতকগুলি বড়-ঘরের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দিলাম। সৈয়দ হুসেনের সঙ্গে নেহেরু-কন্যার পলায়নের কথাটাও বলিয়া ফেলিলাম।[৪৫]

শাস্ত্র আমি জানি না, জানিতেও চাহি না, কিন্তু প্রাণে ক্ষুধা থাকিলে যদি সুধার পাত্র সম্মুখে পায় তবে এমন বীরনারী কয়জন আছে যে বৎসরের পর বৎসর তাহা গ্রহণ না করিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়? ইংলণ্ড-আমেরিকায় কি দেখিতেছি! সেখানে প্রতি-শতে কুড়িটা ছাত্রী বিবাহের পূর্বে সন্তান প্রসব করে ; ইহাতে তাহাদের সমাজচ্যুত হইতে হয় না। যদি ভারতকে তোমরা আমেরিকা করিতে চাও, তবে সে ভিন্ন কথা।

মৌলবী সাহেব তখন আলবার্ট হলে[৪৬] মেয়েদের সর্দার বিবাহ বিল[৪৭] সমর্থনের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন—এই সে দিন ২/৩ শত মহিলা আলবার্ট হলে মিলিত হইয়া 'তালাক' আইনটাও পাশ করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। এর উত্তর আমি আর কি বলিব ভাবিয়া উঠিতে পারিলাম না। হায় হিন্দুনারী, আজ তোমার এ কি মনোবৃত্তি! তোমরা যে দেখছি সারা ভারতটাকে সোনাগাছিতে পরিণত করতে পারলে পরিতৃপ্ত হও। এ কথার কোনো জবাব না দিয়া বলিলাম, 'চতুর্দশ বৎসরের পূর্বে কন্যার বিবাহ দিবার জন্য অভিভাবককে কেহ যখন বাধ্য করে না, যদি উহা অকল্যাণ মনে করেন, তখন দেশকে বুঝাইয়া সেই ব্যবস্থা করা উচিত। তাহা না করিয়া পুলিশের হাতে হিন্দুর যৌন ব্যাপার যাঁহারা দিতে চেষ্টা করিতেছেন তাহারা দেশের ঘোর শত্রু। বিশেষত আমরা যখন শীঘ্রই স্বরাজ পাইতেছি, তখন এ কয়টা মাস সবুর করিলে কি চলে না?'

সেইদিন হইতে আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম এ পাপ ব্যবসায় আর করিব না। রিপু জয় করিতে পারি নাই বটে, চেষ্টা করিব। আমি এখন পাপ ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়াছি। আমার যে টাকা আছে তাহার দ্বারা আমার জীবনের অবশিষ্ট সময় চলিতে পারে। কবে মরিব ঠিক নাই, হয়ত আমার ধন আমার নিজ কার্যে ব্যয় না হইতেও পারে। দালালদ্বয় একটা উইল করিতে বলিলেন, আমি তাহাদের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া একটা খসড়া প্রস্তুত করিতে বলিলাম খসড়া পড়িয়া দেখিলাম, আমার মৃত্যুর পর তাহারা আমার ত্যাজ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারী—এই প্রকার লিখিয়াছেন। আমি বলিলাম, তাহা হইতে পারে না, আমার

মৃত্যুর পর পতিত ও অন্ত্যজ জাতির সেবায় আমার ত্যাজ্য সম্পত্তি ব্যয় করিতে হইবে। পতিতার ত্যাজ্য সম্পত্তি গভর্নমেণ্ট নিয়া যান তাহাতে পতিতার ইচ্ছানুরূপ কোনো কার্যই হয় না, এজন্য কলিকাতার কয়েকটি পতিতা মৃত্যুর পূর্বে—হিন্দুধর্মের যাঁহারা সংস্কারক এমন প্রতিষ্ঠানে দান করিয়া গিয়াছেন, আমিও তাহাই করিব স্থির করিয়াছি। হিন্দুসভা এবং হিন্দুমিশন, এই সকল কার্যে বিশেষ অগ্রণী। ৭